সাহিত্যের সীমানা

জ্যোৎস্না নাথ মল্লিক

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

লীলা,

ছেলেবেলার Lyric Poetry ইংরাজী প্রবন্ধটি তোমার ভাল লেগেছিল। এই প্রবন্ধের বইটি তোমাকে দিলাম।

জ্যোৎস্না

ভূমিকা

প্রবন্ধগুলি গত ত্রিশ বৎসরে বিভিন্ন সময়ে লেখা। বইটির নামকরণের জন্য বন্ধুবর ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। যখন মাত্র দু'তিনটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, প্রায় পনেরো বৎসর আগে, তখনই নানা আলোচনার মধ্যে এই নামটি উল্লিখিত হয়। পুরাতন কয়েকটি প্রবন্ধলেখার প্রেরণা পাই প্রীতিভাজন শ্রীকালিদাস লাহিড়ীর সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য পাঠের সময়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের উৎসাহ ও আয়োজনের জন্য স্নেহভাজন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক ও স্বামী হীরানন্দের নিকট ঋণী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে, মন ও মাটির বিচিত্র ও দ্রুতপরিবর্তনশীল সঙ্গমস্থলে, সীমানা জরীপ দুরূহ কার্য। শিকলের জরীপেই সীমানা আঁকতে আগিয়েছি। বহুজায়গায় পৌছানো যায় নাই। তবে সীমানা বাঁধবার কোন আকাঙ্ক্ষা এখানে নেই। সাহিত্য সমালোচনায় শ্রীঅরবিন্দের পথই আমারও আকাঙ্ক্ষিত পথ—'have made in criticism a practice of appreciating everything, that can be appreciated as a catholic critic would'.

শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ বইটির ছাপা প্রভৃতির ব্যবস্থা করায় তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

'মধুকর'
২১১বি, ব্লক, লেকটাউন
কলিকাতা-৫৫

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক

কাব্য ও কবি

কাব্যে কবির চৈতন্যই শুধু নয়, তাঁর গোটা চিত্তই মুক্তি লাভ করে। বিশ্বের বস্তুসংঘাতে কবির প্রাণ তার হার্দ্যশক্তিতে এক অপূর্ব স্বাধীনতা আস্বাদ করে। সেই আস্বাদনের আনন্দের প্রকাশই কাব্য। বিচিত্র অনুভূতির উপলব্ধি ও চিন্তার আবেগে জড়ের বন্ধন হতে এই মুক্তি ঘটে। এই মুক্তিতে সংবেদনশীল ও সংগ্রামশীল অপরাজেয় মানবাত্মার চির জয়ই ব্যক্ত হয়। মনুষ্যত্বের জয়ের এক অন্তর্দৃষ্টি কবির সকল শ্রান্তি হরণ করে, রক্তক্ষয়ী সকল ক্ষতে শান্তির এক প্রলেপ লাগায়! কবির সাশ্রু নেত্রও তাই এক দিব্যভাতিতে, ক্লিষ্ট বদনও এক নিবিড় আনন্দের জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বরত যুগের মানবহৃদয়ের প্রক্ষোভস্বেদধারাকে কাব্য বলে বর্ণনা করা হয়।[১] কাব্যের উৎস দ্বন্দ্বে। ভেদের আঘাতই প্রথম প্রেরণা জাগায়। ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে বাহিরের সংঘাতেই কাব্যের জন্ম। কিন্তু বাহিরের সঙ্গে অন্তরের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব একটি নিগূঢ় সন্ধি ও শান্তিতে সমাহিত হয়ে কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতির ও পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বের নাটকীয় মানসিক আবহে কবির প্রেরণা ও আবেগ একটি সংশ্লেষ রচনা করে। কবিকে এবং শ্রোতা ও পাঠককে যা মুগ্ধ করে তা সংঘর্ষের চিত্র নয়, সেই সংঘর্ষের উপাদানগুলিকে আবৃত করে কবির সংঘটক চেতনা যে গভীর সংহতির আনন্দরস সৃষ্টি করে তাহাই। কবি বলেন—

"অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।"[২]

শুধু কবির নয় শ্রোতা ও পাঠকেরও তৃপ্তি এখানেই। কাব্য এই মিলনের বাঙ্ময় রূপ—আত্মার আর প্রকৃতির অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। কবির অন্তরের উদার স্পর্শে সকল ভেদ ভেদহীন হয়ে পড়ে। বিষয় বৈষম্য ও পরিবর্তনের রহস্য জানা, অসম্বন্ধকে সম্বন্ধযুক্ত করাই ত ভেদজ্ঞান হারানো, এই ত প্রকৃত জ্ঞান। অনৈক্যের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে কবি একটি পূর্ণ ঐক্যের রূপ প্রকাশিত করেন।

১ **Poetry is the emotional sweat of man's struggle with Nature—*Illusion and Reality* by Caudwell.**

২ মানসী—রবীন্দ্রনাথ

কবিকে তাই গুরু ও কাব্যকে মন্ত্রও বলা হয়।[৩] সদ্‌গুরুই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেন।[৪] বস্তুসত্তার ও আত্মচৈতন্যের আবরণ ভঙ্গই কবির ব্রত।[৫] শেলীর মতে অবগুণ্ঠন মোচন। আত্মার অহংকার, সৃষ্টির অনৈক্য কাব্যে এক বিরাট ঐকতানে সুসম্বদ্ধ ও সুসমঞ্জস বলে প্রতীয়মান হয়।

অন্তরের ও বাহিরের জগতের রসের যে যৌগিক অবস্থা তার ঘটক বলা চলে কবির আমিকে।[৬] কাব্যসৃষ্টির হরগৌরীরূপ চিন্তা করলে মনে হয়, কাব্য সৃজনে বস্তু কর্তা না ব্যক্তি কর্তা, সৃষ্টির পুরুষ কর্তা না প্রকৃতি কর্তার মতোই অবান্তর ও চির অমীমাংসিত প্রশ্ন। কবির আমি বা তাঁর অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা[৭] বিশ্লেষণ করলে দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—একটি তাঁর চিত্তের বা চেতনার বিস্তার আর একটি তাঁর হৃদয়ের আবেগ বা চেতনার রং।

কবির 'আমি' একটি খণ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন আমি নয়—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষমণিদলের মধ্যে সূত্রের মতো একটি সদাজাগ্রত চেতনা। বর্তমানের বস্তু জগৎ ও বাহির, সমাজের অসংখ্য খণ্ড খণ্ড আমি সব সমীকৃত হয় এই চেতনায়। এই সমীকরণ সামাজিক ক্রিয়া। কবির চেতনা সার্বিক সামাজিক চেতনা। কবির চিত্ত সামাজিকৃত চিত্ত। কবি বিশ্বকে গ্রহণ করেন নিজের অন্তরকে বিস্ফারিত করে। সমস্ত বস্তুর 'আছির' ক্ষেত্র কবির এই চেতনা। সৃষ্ট না হলেও বস্তু এখানে আবিষ্কৃত হয়, খণ্ডরূপে নয়, সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে, অস্তিত্বের অনন্যতায়। এই চেতনার বিস্তারে বৈচিত্র্যের সমগ্ররূপ ধরা পড়ে। আপাতঃ সম্বন্ধহীন ব্যষ্টি ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা একটি অখণ্ড সমগ্ররূপে একীকৃত হয়। চেতনার গুণই এই একীকরণ।[৮] কবির চেতনার প্রসার বাহিরের অবস্থা, ঘটনা ও বস্তুর নানাত্বকে একটি সার্বিক সংস্থানে ধারণ ও ধারণা করতে বিশেষভাবে সক্ষম। এই চিত্ত বিস্তারেই অপূর্ব এক মিলনজাত আনন্দ জন্মে। 'আমি আছি', 'আমি জানি' এর সঙ্গে, আমি অনুভব করছি, মিলিত হচ্ছি, এই যে প্রতীতি চৈতন্য উদ্ভূত হয়, তাতেই কবির আনন্দ। নিখিল বিশ্বে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে সহস্ররূপে তিনি অন্তরের অনন্ত সম্ভাবনা আস্বাদ করেন।

৩ সুরেশ চক্রবর্তী—হসন্ত ৪ সদ্‌গুরু মিলাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে

৫ অভিনব গুপ্ত, ধনিক প্রভৃতি অভিব্যক্তিবাদিগণ চৈতন্যের আবরণ ভঙ্গের কথা বলেন।

৬ 'Catalyctic agent'—T. S. Eliot.

৭ অভিনব গুপ্তের মতে প্রতিভার লক্ষণ।

৮ 'Consciousness is integration, *i.e.*, awareness of total situations rather than of unrelated details'—Dunlap.

অনুভূতির বিস্তারে, আত্মা বিশ্বময় ও বিশ্ব আত্মময় হয়ে যায়। সর্ব ব্যাপক এই অহং তার স্ফুরণে বেত্তা ও বেদ্য, গ্রাহ্য ও গ্রাহক, ভোক্তা ও ভোগ্য অভিন্ন হয়ে যায়। বিশ্বে তখন তিনি আত্মারই বিশ্বরূপ দেখেন, নিজেকে যেন নব নব রূপে ফিরে ফিরে পান। কবি গেয়ে ওঠেন, এক হয়ে গেছে আমার জীবন, আর এই ভুবন।[৯] তন্ময়তা বা মন্ময়তা নয়, একটা সর্বময়তাতেই কবিচেতনার উৎকর্ষ। কবির মন যেন বিশ্বমানবমন, সকল বিষয়, সকল ভাবনা, সকল অনুভূতি, সকল প্রেরণা কবিবক্ষে বিধৃত।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি.
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।[১০]

মনুষ্য সমাজের সকল কালের মন—অতীতের সামাজিক মানস, কবিমনকে কেন্দ্র করে বর্তমানের বস্তুকে ও বাহিরকে আলিঙ্গন করে।[১১] অন্তর ও বাহির এই চেতনায় এক। জীবনের ও জগতের সকল বিষমতা ও বিরোধ, সকল খণ্ডতা, সকল অসংলগ্নতা একটি সমগ্ররূপে সংস্থিত হয়ে কবিচেতনার আলোকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত স্থষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিকীর্ণ করে।
ঐ চাঁদ, ঐ তারা, ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।[১১ক]

৯ রবীন্দ্রনাথ।

১০ রবীন্দ্রনাথ; Wherever pain is—there I am
On every single tear that is shed
I myself am crucified.'
Cecil Dey Lewis.

১১ রবীন্দ্রনাথ - ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিয়ে
সর্বত্রগামীরে।

১১ক রবীন্দ্রনাথ।

স্বাতন্ত্র্যের গহন অরণ্য হতে নিষ্ক্রমণ করে কবিমন বিরাটের সম্মুখীন হয়, বাহিরের সন্ধান পায়। জগতে আর হৃদয়ে তখনই কোলাকুলি সম্ভব। বিরাটের স্পর্শে প্রাণ প্রকাশশীল হয়ে ওঠে। কাব্য ও সাহিত্য চেতনার এই নিষ্ক্রমণ ও সঙ্গমের ইতিহাস ও বিকাশ।

কবিচিত্ত সর্বমানবচিত্তের প্রতিনিধি একটি সামাজিক চিত্ত। বহির্মুখী সংবেদনশীল কবিমন সামাজিক, তাই চেতনশীল। সমাজহীনতা চেতনাহীনতারই সামিল।[১২] কবির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে এই চেতনার বিস্তার বিশেষভাবে যুক্ত। মনের প্রসার ও প্রশস্ততা কবির সৃষ্টির সর্বজনীনতার কারণ। কবির 'আমির' চেতনা ও চরিত্রের দিক সম্বন্ধে বলা চলে যে এখানে সর্বকালের সর্বসামাজিক মনের আবেগ ও চেতনা, জগতের গরিষ্ঠ সাধারণ সংজ্ঞা ও সংস্কার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যনিরপেক্ষ যোগীর নির্বেদ এই সামাজিকতার অভাবের দিক, কাব্য এই সামাজিকতার চরম সদর্থক দিক। সমস্ত সৃষ্টির পিছনে এক বিরাট মনের পরিচয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও পেতে আরম্ভ করেছেন।[১৩] সেই সামগ্রিক তপঃশীল স্রষ্টামনের ক্রিয়াপদ্ধতির আভাস কবির চেতনায় কিছুটা পাওয়া যায়। "The 'I' of a poem is more often than not a dramatic or representative I. He is medium of a creative force a reed through which the spirit blows."[১৪] ভাগবতশক্তির লীলাসঙ্গী কবিমনের চেতনাতেও এই বিশ্ববোধ। অরবিন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—'মহান প্রভু বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছেন, ফুৎকার তাঁর নিজের, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র আমাদের মন।'

কবি 'আমি'র চেতনার জন্য সমাজের নিকট ঋণী। কাব্যের চিন্তা, ভাষা, বিষয় সামাজিক। কবি একজন সামাজিক হিসাবে উপাদানের জন্য সমাজের মুখাপেক্ষী। সামাজিক স্মৃতি ও সংস্কার, সমাজের ইতিহাস ও অনুষঙ্গ ব্যক্তিচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, সমৃদ্ধ করে ও গড়ে তোলে। সমাজের সাধারণ ভাণ্ডার হতেই কবিমনকে বস্তু ও অভিজ্ঞতা, ভাষা ও চিন্তা আহরণ করতে হয়। প্রত্যেক সামাজিকই কিন্তু কবি হন না। বস্তুর অস্তিত্বের প্রক্ষেপে বা পরিবেশের সংঘাতে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ও সংঘবদ্ধ মানবমনে মুক্তির প্রয়োজনবোধ জাগে। সমাজের ও ব্যক্তির এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষা কাব্যে রূপায়িত হয়। সমাজের আবেগ কোনো ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে মূর্ত হয়ে ক্রিয়াশীল হয়।

১২ 'Keeping the consciousness on social rails is merely keeping it conscious.—Caudwell ১৩ Jeans. ১৪ অরবিন্দ।

কবি তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ে এই বিশিষ্ট বা জাতিরূপ স্পন্দনকে ভাষায় রূপ দান করেন। ব্যক্তিহৃদয়ের ঐ অভিজ্ঞতা সংবহনে কবির বস্তু পরিগ্রহণের একটি বিশিষ্ট আবেগ, চিন্তনের একটি বিশিষ্ট ধারা, প্রক্ষোভের একটি বিশিষ্ট গতি, সহানুভূতির বা স্বজ্ঞার একটি বিশিষ্ট দ্যুতি প্রকাশিত হয়। কবির আমির ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় এখানেই। এখানেই কবিচেতনার রং। কবির প্রেরণা ও অনুভূতির বেগ বস্তুমণ্ডলে অনুবিদ্ধ হয়ে যে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে একটি অনন্যরূপ গ্রহণ করে, তাতেই কবির স্বাধীন সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তা ছাড়া কাব্যে কবিব্যক্তিটির আর কোনো পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে না। কবি হৃদয়ের আবেগেই কাব্যের অভূতপূর্বতা, আশ্চর্যময়তা। এখানেই আবিষ্কর্তা স্রষ্টা।

আবেগ তার প্রকাশ হতে ভিন্ন নয়। বিশিষ্ট একটি ভাষার রীতিতেই ভাবকে, অনুভূতিকে ও চিন্তাকে সমাজের সামনে বার হয়ে আসতে হয়। বিষয়ের ভাণ্ডারের মতো ভাষার ভাণ্ডারও সামাজিক। নির্বাচনে ও সংগঠনে কাব্যের ভাষায় আবেগবান এক সামাজিকের প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বই ফুটে ওঠে। ব্যক্তিহৃদয়ের স্বাধীন আবেগ বস্তুকে পূর্ণভাবে সিঞ্চিত করে। হৃদয়বৃত্তির রসে জারিত হয়ে বস্তু অভিন্নভাবে কবির আপনার হয়ে যায়। প্রকাশের ভাষাও আবেগের প্রতীকত্বে ধ্বনিময় হয়ে উঠে। ব্যক্তির স্পর্শে বস্তুতে ও ভাষাতে নবীনতার রং লাগে। বহু কালের বহু সামাজিকের সঙ্গসমৃদ্ধ বস্তু ও ভাষায় এক নূতন ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে। যুগের যুগের সমাজমনের আরোপিত অনুষঙ্গসমৃদ্ধ সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তুর রূপ প্রকাশ করার সময় কবি তার হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট অনুভূতির রংও মিশিয়ে দেন। বস্তু এক অভিনব লাবণ্য ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

ধরণীর তলে, গগনের গায় সাগরের জলে অরণ্যছায়,
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব।

কাব্যের রঞ্জন ধর্মের রহস্য কবির এই ব্যক্তিত্বে। আনন্দিত কবিচৈতন্যের সংবেদন ও আস্বাদ রসানুভূতির স্পর্শে বস্তুকে রঞ্জিত করে, সমাজমনকে অনুরঞ্জিত করে। বিপুলা এ পৃথ্বীর বস্তুসম্ভারের ও জীবনবাহুল্যের শ্রেয়তা কবিমানসেরই সৃষ্টি মনে হয়। চেতনাসম্পন্ন অনুভূতিশীল ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ সমাজমনে সঞ্চারিত হয়ে নূতন সামাজিক উদ্দীপনা জাগায়।

বস্তুর প্রত্যক্ষরূপ কি তা কাব্যে ধরা পড়ে না; বিজ্ঞানেও ধরা পড়ে না বলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেছেন। বস্তুসত্তার বৈজ্ঞানিকরূপে বৈজ্ঞানিকের

আমি বিশেষভাবে অনুপ্রবিষ্ট।[১৫] বস্তুর আকার ও ভাব, স্থিতি ও গতি পর্যবেক্ষকের আমির উপর বিশেষ নির্ভরশীল।[১৬] বিজ্ঞানও আমাদিগকে অহং এর দুয়ারে এনে একলা ফেলে গেছে বলা হয়।[১৭] সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ঘটনা নির্বাচনেও ব্যক্তির নিজের ভাব, প্রকৃতি, অন্তর্দৃষ্টি সমভাবে অনুপ্রবিষ্ট।[১৮] বের্গসঁর সংজ্ঞায় বা পাতঞ্জলির প্রজ্ঞায় বস্তুর যে পরিচয় মেলে তা প্রায় ব্রহ্মের স্বরূপের মতোই অনির্বচনীয়। কাব্য উপভোগ বা বিচার করবার জন্য এইটুকু মেনে নিলেই যথেষ্ট যে কাব্যের বাস্তব বস্তু ও চেতনার একটি সম্মিলিত রূপ। ব্যক্তির ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ভয়, বিস্ময় সুখদুঃখ বোধ, ব্যক্তিচেতনায় জাতির সমগ্র অতীত জীবনের জ্ঞান ও সাধনা, সংস্কৃতি ও স্মৃতি, অনুভূতি ও অনুষঙ্গ বস্তুর অস্তিত্বকে ঘিরে একটি মানসিক বাস্তবের সৃষ্টি করে। এই বাস্তব বা বিভাবই কাব্যের উপাদান। কবিমন প্রকৃতির আর্শি নয়—কারণ আর্শি জানে না, অনুভব করে না। বাস্তব হল মনের একটি বাছাই করা বা মিলিত করা পরিবেশ। সম্বন্ধ যুক্ত করাতেই কাব্যের বস্তু সৃষ্টি। আত্মীয়তাতেই পরিচয়। চেতনায় যা প্রত্যক্ষ, চেতনায় যা স্বীকৃত তাই কবির বাস্তব, প্রতিবিম্ব নয়, একে প্রতিরূপ বা প্রতিমা বলা যেতে পারে। এই মানসিক প্রতিরূপেই বস্তুর প্রকাশ। এই বস্তুচেতনা সামাজিক। সমাজমনের সমগ্র চেতনায় যা প্রত্যক্ষ তাই কবির বাস্তব বা কাব্যের ক্ষেত্র বলা চলে। এই ক্ষেত্রের একটি বিশিষ্ট ভাব আবেষ্টনকে ঘিরে কবির আবেগ রূপ সৃষ্টি করে। এই নির্বাচন ও আবেগ মিলে যে কাব্য তা প্রকৃতির অনুকরণ শুধু নয়। সামাজিকতার একটি বৃন্তে সংহত ও মণ্ডলায়িত হয়ে ব্যক্তি-হৃদয়ের আবেগ একটি পুষ্পের মতোই অভিনব সৃষ্টি হয়ে ওঠে। বস্তু সত্তারই রূপসৃষ্টি করে না। বাহিরকে আন্তরিক করে, আয়ত্ত করে কবিহৃদয়ে আবেগের যে সংগঠন হয়, কাব্য তারই সাক্ষ্য বা প্রকাশ।

কবির আবেগ সমন্বয় সাধনের অমোঘ শক্তির প্রকাশ—যে শক্তি অবিশ্রাম সমাজে ও জগতে কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলছে। এই শক্তির উপরই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত।[১৯] আবেগশক্তি বস্তুসংঘাতের সম্ভাব্য সংহতির যে প্রাক্ আস্বাদন করে তার মধ্যেই শান্তি ও সৌন্দর্য। প্রক্ষোভের প্রচণ্ডগতি বস্তু আয়ত্ত করতে তীব্র প্রেরণা জাগায়। 'আবেগের বস্তু আস্বাদন বা সম্ভোগ তাকে রূপে পরিণত করে। তার

১৫ Eddington, Jeans. ১৬ Einstein. ১৭ Planck. ১৮ Pater

১৯ সুন্দর—শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথ

ব্যঞ্জনা বাহিরকে সুষমামণ্ডিত করে। সামাজিক আবেগের ব্যঞ্জনার স্মৃতি ও ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতির প্রক্ষেপে বাস্তব সৌন্দর্য।

হিউম, মিচেল, হেগেল, ক্রোচে[২০] প্রভৃতি দার্শনিকগণ, রিচার্ডসের[২১] মতো সমালোচক, কোলরিজের[২২] মতো কবি নিসর্গের এই আরোপিত সৌন্দর্যের কথাই বলেন। কেউ বলেন নিসর্গ আমাদের একটি চিত্তাবস্থা মাত্র। কেউ বলেন আবেগ প্রশমনেই সৌন্দর্য। কেউ বলেন অনুভূতি প্রক্ষেপেই বস্তুর রমণীয়তা।[২৩] মুক্তিকামী আত্মা চেতনার বস্তুজগতে আবেগের ঐশ্বর্যে এক জ্যোতি বিকীরণ করে। এই দ্যোতনাই রূপ, এই আবেগই সৌন্দর্য। কবির আমির চেতনায় যা খণ্ড খণ্ড তা এক হয়, চাঁদ তারা গাছগুলি বিরাট হয়, সম্পূর্ণ হয়। কবির আমির আবেগ সুন্দর করে। কবি বলেন—

আমার চেতনার রং এ পান্না হ'ল সবুজ চুনি উঠলো রাঙা হয়ে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর সুন্দর হ'ল সে।[২৪]

কবির আবেগের অনুপ্রবেশেই বস্তু সুন্দর। প্রয়োজনবোধ ও মুক্তি প্রেরণা, গ্রহণশীল চেতনা ও রূপকার আবেগ কাব্যের সুন্দর সৃষ্টির মূলে। সচেতন কবি তাই নিজেই এই লীলায় ও ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হয়ে বলেন,

যে আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথ স্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুন আপনারে চেতনার জাগ্রত ভুবনে।
আমারি ঐশ্বর্য তাই হেরি আমি তার দেহ মাঝে
তাই সে সুন্দর হেন, সাজিয়াছে মোর দেওয়া ফুল্ল ফুল সাজে।[২৫]

নন্দনতত্ত্বে অনেক দার্শনিক এই মন্ময়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।[২৬] অনুপ্রবিষ্ট বা আরোপিত আবেগই বস্তুসৌন্দর্যের মূলে। অনুভূতি প্রক্ষেপে বা অধ্যারোপেই বস্তুর রমনীয়তা। কবিমনের সহানুভূতি নয়, হৃদয়ের রং, মূর্ছনা ও ভাবাবেগ প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট, তাতেই কবিমনের সৌন্দর্যসম্ভোগ বা প্রক্ষোভ-তৃপ্তি। এই সংজ্ঞা নিরূপণ করে একজন দার্শনিক লিখেছেন—'The general principle of empathy was that though the sensible appearance

২০ Croce—'A landscape is a state of mind.'

২১ Richards—'Beauty is emotional satisfaction.'

২২ Coleridge—'We receive but what we give/And in our life does Nature live.

২৩ Theodor Lipps ২৪ রবীন্দ্রনাথ ২৫ মোহিতলাল।

২৬ Theory of Einfuhlurg or Empathy, Theodor Lipps.

of the thing called beautiful is object of aesthetic satisfaction, it is not the ground of that satisfaction. That ground is rather feelings and activities of the self read into the object and contemplated as residing there."[২৭] আর একজন বলছেন—Empathy signifies the imaginative projection of one's consciousness into an object or person outside oneself. We effect a psychic identification. We stop being an outsider and become an insider'.[২৮]

এই উপলব্ধিতে কবি নিজের ক্ষুদ্রতা ও বিরাটতা, মানবমনের সান্ত ও অনন্তের মিলনজাত রস আস্বাদ করেন। অনুভূতি শুধু জগতকেই আপন করে না, জগৎ আমিতে লীন হয়ে যায়। ক্ষুদ্র আমি ভূমার আস্বাদে, সর্বসম্ভাবনার সাক্ষাৎকারে আনন্দ ও জীবনের গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কবি আপনি জগতে তখন আপনার বিভূতি বা বিশ্বরূপ যেন দর্শন করেন।

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ আমি তার শশী রবি,
আমি আলোছায়া গীত ও গন্ধ মাঠ দিগন্তশোভী।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল আমিই কুমুদ, আমিই কমল,
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ, আমি তার দীন কবি।[২৯]

কবির আমি শুধু একটি সচেতন ভবিষ্যসত্তার বা দ্রষ্টার 'আমি' নয়' এ 'আমি' নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধেও সচেতন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে, কবিরে খুঁজিবে তাহারি জীবন চরিতে।' আবেগ এই দুই আমির মধ্যে সেতু স্বরূপ। সম্ভাবনীয়তার স্রষ্টা আমিকে কবির ছোটো আমি বলেন—

নামে এক বটে—সমপ্রাণ তাও মানি
কাছাকাছি থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে রহ।
তোমার অজয়ে পুলক প্লাবন আসে
আমার অজয়ে ভাঙে ভূই, ভাঙে বাড়ী,
তব বসন্ত ভরা শুধু ফুলবাসে
মোরে মশামাছি জ্বালাতন করে ভারী।
উদয়গিরির তোমাকে পাঠাই ভেট,
অস্তাচলের শিখর হইতে আমি।[৩০]

২৭ Art and Aesthetic Theory—Carrit

২৮ The Mature Mind—Overstreet, ২৯ কুমুদরঞ্জন ৩০ কুমুদরঞ্জন

বিশ্বচেতনার এই আনন্দসূর্যালোকে কবিহৃদয়ের সৌন্দর্যকমল কাব্যরূপে বিকশিত হয়। জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান, যা অমৃত ওঠে তাই তিনি সমাজকে, সহৃদয়কে দান করে যান।[৩১]

বস্তুকে শুধু চিত্তাবস্থা বলে স্বীকার করা অবশ্য কঠিন। বাহির বিশ্বের সকল বস্তু একই অনুভূতি জাগায় না। সকল বস্তুতেই গোলাপফুলের উদ্বুদ্ধ ভাব আরোপিত হয় না। গোলাপফুল বা সূর্যোদয়ের রম্যতা বহু সামাজিক কবিহৃদয়ের সৃষ্টি। সমাজের স্মৃতিভাণ্ডারে বা ব্যক্তির চেতনায় গোলাপের বা সূর্যোদয়ের এই সামাজিক বা মানসিক রূপই তার আসল রূপ হয়ে দাড়িয়েছে। ইংরাজি ডেজী ফুলের গন্ধ কবিরই সৃষ্টি। গোলাপের গন্ধে প্রেমপরিমল, তাই প্রিয়ার অনুষঙ্গে ডেজীতেও সুবাস আরোপিত।[৩২] তবু বস্তু সত্তা শুধু কবিমানসে নয়। শ্রীঅরবিন্দ মন্ময়তার অসঙ্গতি সম্বন্ধে বলেন—'In that case beauty is non-existant in Nature, it is put upon Nature by our mind through Adhyaropa, But this contradicts the fact that it is in response to an object that the idea of beautiful rises.' কবির 'আমি' বাহিরকে অস্বীকার করে না, কারণ কবির ক্ষুদ্র 'আমি' সর্বকালের সকল 'আমি'র উৎস এক বিরাট 'আমি'র সঙ্গে যুক্ত। এই ত সোহম্ তত্ত্ব। নিখিলের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ বা বিশ্বানুভূতি। সোহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিপ্রায় মন্ত্র।[৩৩] এই বড় আমি আবিঃ প্রকাশ স্বরূপ। এই জগৎ তাঁর প্রকাশ। এই প্রকাশের বৈচিত্র্যের মূলে আনন্দ। কবির 'আমি' সেই উৎসে পৌচেছে। এই অহং এর উপলব্ধির পথ দুটি—একটি সামাজিক বস্তুজীবনের প্রসারতায়, অন্যটি আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ স্ফূর্তিতে। সৌন্দর্য ক্ষুদ্র 'আমির' চিত্তাবস্থায় নয়। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'All things are creations of Universal consciousness. Beauty also. The experience of the individual is his response to his awakening to the beauty which the universal consciousness has placed in things, that beauty is not created by individual consciousness.'

কবির আমি যে সৌন্দর্য জগতের সৃষ্টি করে তাকে অলীক বা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ফ্রয়েডের মতে মানুষের উপহত সহজ প্রবৃত্তি জীবনের

৩১ রবীন্দ্রনাথ। চৈতালি

৩২ Lowes

৩৩ রবীন্দ্রনাথ।

রূঢ় আঘাত হতে মনগড়া এক কল্পনালোকে ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য সৌন্দর্যের এক অধ্যাস জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু কাব্যের জগৎ মিথ্যা বা প্রতিভাসিক নয়। কাব্যের বিভাব রজ্জুতে সর্পভ্রম নয়। নন্দনতত্ত্বের এই মায়াবাদ জীবনসত্যের অপলাপ করে। বৈজ্ঞানিকগণ জগৎ সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞানকে আত্মমুখ বিমূর্তন বলছেন।[৩৪] তাঁদের সৃষ্ট জগৎ তাঁদের মতে সম্পূর্ণ অলীকই।[৩৫] জীন্‌সের মতে বৈজ্ঞানিকগণ ছায়া জগতে বাস করছেন, ছায়া সম্বন্ধেই তাঁদের গবেষণা এবং ছায়ার পিছনের সত্য সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ। প্রত্যেকের চোখের রামধনু বস্তুজগৎ হতে তার একটা বাছাই করা আত্মমুখ নির্বাচন। বিজ্ঞানের এই জগতকে যতই ছায়া জগৎ বলা হোক, বস্তু তাতে পরিবর্তিত হচ্ছে, সত্য প্রয়োজনের দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে। মানবমনের গঠন ও সীমা মেনে নিয়েও, বাহির প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটাতে, এই গবেষণার প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিকের মতো কবিও পরিবেশের সঙ্গে প্রবৃত্তির, কার্যকারণতার সঙ্গে সৌন্দর্যের, প্রয়োজনের সঙ্গে কামনার মিল ঘটাতে সর্বদা সচেষ্ট। মুক্তির আবেগে অন্তরের ও বাহিরের যে পরিবর্তন সূচিত হয় ও সাধিত হয় তাকে নেহাৎ অধ্যাস বলে অবজ্ঞা করা চলে না। সমাজ জীবনকে যদি গ্রহণ করতে হয়, জীবনকে ও সমাজকে যদি পরিবেশের সঙ্গে বিশিষ্টভাবে মিলিত করতে হয়, সমাজের মাঝে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফুরণের যদি ক্ষেত্র রচনা করতে হয়, তবে বস্তুর সঙ্গে জীবনের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সমন্বয় ঘটানো ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সামাজিক বৈজ্ঞানিক মন খণ্ড বস্তু নিয়ে, পরিবর্তনের গবেষণায় ব্যস্ত। সেখানে বস্তু নিরন্তর বিমূর্ত হয়ে সাধারণীকৃত হচ্ছে। সামাজিক কবি মন বস্তুপুঞ্জ নিয়ে পরিবর্তনের আলোকধারায় মিথস্ক্রিয়ার নব নব আবির্ভাবে হৃদয়ের বর্ণালী বীক্ষণে ব্যস্ত। সেখানে বস্তু তার সমস্ত অনন্যতা নিয়েই আবেগের সমতানে মূর্ত হয়ে উঠছে। সমগ্র বস্তুকে নিয়ে এত বড় পরীক্ষা কোনো গবেষণাগারেই চলে না। জীবন দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়, মনের প্রতিটি বৃত্তি দিয়ে প্রতিটি দ্রব্যের পরীক্ষা এখানে। বস্তুর নিকষে আত্মজীবনের অবিরাম বিচার চলছে কবিমনে। জ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞান বস্তুকে, পরিবেশকে পরিবর্তন করে, অনুভূতির দ্বারা, অভিযোজনের দ্বারা, মিলনের দ্বারা কাব্য মানবহৃদয়কে পরিবর্তন করে। বিজ্ঞানে প্রভুর পরিচয়, কাব্যে অনুভূর।

৩৪ **Eddington**

৩৫ **Jeans**

এই অনুভূতির জগৎ অসত্য নয়। আবেগের প্রেরণা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি পলায়নী মনের মিথ্যা কল্পনা বিলাস নয়। কাব্য বাস্তবের চরম রূপ উদ্ভিন্ন করছে।

আবেগের উদ্দীপন শক্তি ও কর্মপ্রবর্তনা মনস্তাত্ত্বিকগণ স্বীকার না করে পারেন না।[৩৬] কাব্যের প্রক্ষোভসঞ্চার একটি সামাজিক ক্রিয়া। সামগ্রিক কর্মশীলতার উন্মেষ এই প্রক্ষোভে।[৩৭] তুচ্ছতার জালে আবদ্ধ মানুষের অবস্থাই যদি নৈরাশ্যবাদীদের সঙ্গে অনিবার্য বলে মানা হয়, তা হলে জীবনে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়, মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে ক্লীবত্বকে বরণ করতে হয়। কবি যদি হার মেনে নিতেন তা হলে আর কবিতা লিখতে বসতেন না। বৈজ্ঞানিকও ছায়াবাজির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করতেন না। নিরাশার কবি কি অনির্দেশ্যের বৈজ্ঞানিক একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি। তবু তাঁরা নিরাশার ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সামাজিক চেতনার ক্রিয়াশীলতার সাক্ষী। বস্তুর সংঘাতে প্রাণশক্তির নিরন্তর মুক্তি কামনার যে সন্ধান চলেছে কবির মনের গহনে, সেই প্রয়াস স্বতঃই ক্রিয়াশীল ও সৃজনশীল। নিরাশাও তাই কাব্য সৃষ্টি করে। কাব্যে সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত ঈপ্সিত হয়। অন্ধকার নৈরাশ্যের ও ব্যর্থতার মধ্যেও, সামাজিক চেতনা এবং কবির হৃদয়াবেগ নিরাশাকে চিত্রিত করে। রোগকে নির্দিষ্ট করে। কবি মনের গহনে একটা বিধান ও ব্যবস্থার অনুসন্ধিৎসা সকল নৈরাশ্যের মধ্যে সূচিত হয়।

কবির আমির আবেগ মানুষের সম্ভাবনার ও বস্তুর সম্ভাবনার প্রতিভানে অন্তরের ও বাহিরের একটি সংহতির রূপ প্রকাশ করে। এই সম্ভাবনার পরিণতির পৃথক আস্বাদে বস্তুতে রূপ সঞ্চারিত হয়। সামাজিক মন জগতকে আস্বাদ করতে অনুপ্রাণিত ও নিমন্ত্রিত হয়। এই প্রাক আস্বাদনই সকল চিন্তা ও চেষ্টাকে চাড়া দিয়ে তোলে। এখানেই কাব্য ও বস্তুর রহস্যময় মিলনসেতু।[৩৮] এই সম্ভাবনীয়তার রূপ সুস্পষ্ট হলেই কাব্য সমাজমনকে উদ্দীপিত করে। এই ভাবে রসসঞ্চারে বস্তুজগতকে রমণীয় করার ব্রতই কবির। কবির জন্যই দ্রব্যের চমৎকারিত্বের শেষ নেই। বাস্তবের প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়ে বৈরাগ্য সাধন চলে, কাব্য চলে না। কবি বৈরাগী নন, অনুরাগী। ক্ষোভে ও অভিমানে, রসসৃষ্টির জন্য যে নিরাসক্তি, যে প্রেমিকের দৃষ্টির প্রয়োজন, তা থাকে

৩৬ Canton. ৩৭ Watson.

৩৮ Goethe—'This forefeeling is the lever in all our search and in all our thinking, the mysterious link between poet and fact'

না। অনুরাগেই বস্তুর নিগূঢ় সদ্‌ভাব প্রকাশ পায়। বস্তুজগতের লাবণ্য কবির আমির আবেগস্পর্শে। কবিদিকে বলা চলে—'Ye are the salt of the earth'.[৩৯]

কবির বিশ্বচেতনায় প্রকৃতির জীবন ও সমাজ জীবন, রূপ ও কুরূপ, কীট ও কুসুম সমন্বিত। শিল্পীর নিরাসক্ত মন বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশকে আশ্চর্যবৎ দেখে। একই প্রাণের বহুধা প্রকাশে একটি অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ জন্মে। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যজীবনের ঐক্যে কবি পরিবেশকে উদাসীন, মানুষকে প্রবাসী দেখেন না।[৪০] কবির অনুরাগদৃষ্টিতে বিশ্বচেতনায় সকল অভাব, সকল অসম্পূর্ণ ভাবসম্পদে পূর্ণতালাভ করে। কষ্ট ও কদর্যতা, কীট ও কণ্টক, বীভৎস ও বিক্ষত, কবির চেতনার সর্বগ্রাহিতায় স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও এক আবেগ প্রকরণের বা প্যাটার্নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে অর্থপূর্ণ, সুসমঞ্জসও অস্তিত্বে শোভন হয়ে ওঠে। তাদের তত্ত্ব বা সম্পাদ্য কাব্যের বিচার্য নয়। তাদের সত্ত্ব শুধু কবি স্বীকার করেন, রসের একটি সম্পূর্ণ আবহ রচনা করতে। এই পরিগ্রহণেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কবির চেতনার এই সর্বদর্শিতা কবির প্রেরণাকে ও আবেগকে বিচ্ছিন্নতা ও তুচ্ছতা হতে রক্ষা করে। যাঁর মনের গহনে অনন্ত সঙ্গীতের অনুরণন তাঁর কাছে অসুন্দরের খণ্ডতা তালভঙ্গ করে না। পৃথিবীর বেসুরো বস্তু সংঘাতের জন্য তিনিই আক্ষেপ করেন যিনি প্রেমের দ্বারা মনের মতো একটি সুন্দর জগৎ গড়তে চান।[৪১] যিনি খণ্ডদৃষ্টি ও ভেদবুদ্ধির পীড়া জানেন তিনিই আক্ষেপ করতে পারেন—On Margate sands I can connect nothing with nothing.[৪২]

কবির মননের আনন্দজগৎ অলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। তবু হৃদয় যেখানে দ্বন্দ্বের অবসান দেখে, সীমার মাঝে অসীমের সুর সেখানে বেজে ওঠে।

> "এ সমস্ত ছন্দভাঙা অসংগতির মাঝে
> সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
> নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
> সব ভুলে যাই;

৩৯ St. Mathews, ch. V. 13

৪০ রবীন্দ্রনাথ

৪১ W. B. Yeats ৪২ T. S. Eliot

মন যেন ফিরে,
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে।"[৪৩]

ব্যক্তি হৃদয়ের আবেগের সর্বজনীনতা সামাজিক চেতনায়। এখানে যুক্ত থাকলে, কবির সৃষ্টির আনন্দ আত্মরতির আত্মভাব স্পর্ধায় অলীক ও অর্থহীন হয় না। কবির 'আমি'কে আক্ষেপ করতে হয় না—

"পলাতক হিয়া মোর খুঁজিয়াছে একান্ত নির্জন,
আপন কল্পনাকুঞ্জ, বুনিয়াছি বসি সেইখানে
বাণীর বসনখানি—বিলাসের মায়া আস্তরণ
হেসেছি কেঁদেছি শুধু স্বপনের সখাসখী সাথে।"[৪৪]

জীবন হতে, সমাজ হতে চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করলে স্বপনের সখাসখী নিয়ে বিলাস চলে, সামাজিক সহৃদয়ের সঙ্গে আলাপ ও হৃদয় সংবাদ চলে না। অরণ্য মর্মর থেকে নির্বাসিত টবের গাছের এক দরিদ্রজীবন তখন কবির ভাগ্যে।[৪৫] আর কাব্য কৃত্রিম ও অসামাজিকতা দোষদুষ্ট খেদখেউড়ে পর্যবসিত হয়। চেতনার বিস্তার বস্তুঘেরা আবেগের পশ্চাদভূমি। এই প্রমা চৈতন্য আবেগের বস্তুকে পরিমিত ও সংগতি দান করে। হৃদয়কে মাকড়সার মতো প্রমাজাল বিস্তার করে রাখতে হয়, তবে বস্তু ধরা পড়ে, তবেই মন বস্তুরূপ ও বস্তুরূপ মনোময় হয়ে ওঠে।[৪৬] চেতনার বিস্তৃত পাদপীঠের অভাবে বস্তু ও আবেগ খণ্ডিত অর্ধসত্য হয়ে থাকে—অসংলগ্নতায় অর্থহীন। সর্বদর্শিতা ভিন্ন সৃষ্টি হয় না।[৪৭] কবিকে তাই যেখানে আশার বাণী তা শুনতে হয়, যেখানে বেদনা তাই অনুভব করতে হয়। সামাজিক চেতনার পথে চলে, আবেগ এই অবাস্তবতা হতে রক্ষা পায়। সামাজিক চেতনায় যখন হাড় বের করা, সিং ভাঙ্গা কাকের ঠোকর খাওয়া ক্ষতপৃষ্ট গ্রন্থিশিথিল ল্যাজওয়ালা গরুর দল, তখন কাব্য তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্য শুধু অভাবের হাড় বের করা ক্ষত পৃষ্ঠ গরুর কথা বললেই কাব্য হয় না। ভাব ও অভাবের, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গতি সাধনেই কাব্যের চেতনা ও আবেগের ক্রিয়াশীলতা ও সৃজনশীলতার গৌরব।

কবির ছোটো 'আমি' যদি তার সামাজিক বন্ধন ভুলে যায়, মাটির পথ ভুলে ছায়াপথই তার পথ বলে বসে, তখন কাব্য খেয়ালীর ক্রীড়নক হয়ে পড়ে।

৪৩ রবীন্দ্রনাথ
৪৪ মোহিতলাল
৪৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬ পঞ্চদশী
৪৭ Koestler

এই কাব্যের আবেগ সমাজকে তখন সম্ভাবনীয়তার লক্ষ্যে পৌছাতে অনুপ্রাণিত করে না। বাস্তবের সঙ্গে অভিযোজনহীন মনই অচেতন। অচেতন মনের আবেগ অসামাজিক, তাই সে সামাজিকদের মনে সংক্রমিত হয় না। আত্মস্পর্ধা ও নীতিহীন কাব্য অচেতন মনের সৃষ্টি।[৪৮] আবেগ একটি শূন্য বৃন্তে মণ্ডলায়িত হলে বা ভাবালুতায় শুধু পল্লবিত হলে জীবনধারার সঙ্গে বিয়োগে স্বতঃই শুকিয়ে যায়। চেতনায় বাস্তবের যে ভূমি তা হতে রস সংগ্রহ করেই আবেগের সৌন্দর্য সৃষ্টি।

'আমি আছি', 'আমি জানি', 'আমি হই' এর মিশ্র উপলব্ধি কবির আবেগের ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে। বিষয় ও আত্মা, চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা এক সচেতন আবেগের সুষম ব্যঞ্জনায় সংগঠিত হয়ে কাব্যে রসধ্বনি সৃষ্টি করে। সামাজিক শব্দ ও ভাবাভিব্যক্তি আবেগের ব্যঞ্জনায় যে রূপ পায় তাই কাব্যের আত্মা।[৪৯] কবির আমির চেতনা বিষয়মুখ, সেখানে বিশ্ব, আমির আবেগ আত্মমুখ, সেখানে কবি ব্যক্তিটি।[৫০] এখানে কবির ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ ও পরিচয়। এই দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাতেই কবির বৈশিষ্ট্য। এ প্রায় Style is the man[৫১] হয়ে দাঁড়ালো।

আজকাল কাব্য সমাজে প্রায় অপাঙক্তেয়, কবি হয় অবজ্ঞার নয় করুণার পাত্র। শেলীর যুগেও একজন সমালোচক[৫২] মনে করেন যে কাব্যের স্থান বিধিহীন লৌহযুগে, যখন যুদ্ধমান তস্কর বীরদের স্তুতিগান করাই কাব্যের লক্ষ্য ছিল। সমাজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হলে কাব্য নাকি নষ্ট হয়। তখন কবিরা অতীতের স্বর্ণযুগের দিকে তাকান, যুগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও। এটা কাব্যের পিতলযুগ—স্বসমাজচ্যুত কাব্যের দ্বিতীয় শৈশব। সভ্যযুগে কবিরা তখন আধা সভ্য মানুষ। কিন্তু কাব্যের পক্ষে শেলীর যুক্তি এখনও স্মরণীয়। কবি বর্তমানের বস্তুজগতের বিধি নির্দেশ করেন, আর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেন। তাঁরাই পিতল যাঁরা কারণ বহির্ভূত অতীতের একটা মায়াজগতে পলায়ন করেন। কবির কল্পনা সামাজিক আত্মীয়তার বাহন। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা কল্পনা সাপেক্ষ সামাজিক ক্রিয়া।[৫৩] কল্পনা আবার কোনো কবির ভাষায় অনুভূতির প্রসার—'অনুভূতি করে দেয় জগৎ আপন'।[৫৪] কাব্যের প্রেরণা স্তব্ধ হয় না, কারণ মানুষের সৃজনশীল আবেগ চিরন্তন। পরিবেশের বিকৃতি ও নৈরাজ্য

৪৮ Jung ৪৯ কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ—আনন্দবর্ধন ৫০ Caudwell
৫১ Buffon ৫২ T. Peacock ৫৩ Shelley ৫৪ কুমুদরঞ্জন

অনেক কবিমনকে বিকৃত করে। কেউ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অলীক জয়গানে আপনাকে ঘিরে আত্মরতির মিনারঘর রচনা করেন—সেখানে সংসার হতে পালিয়ে কথার মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন, যা সম্পূর্ণ নিজের। তিনি সাধারণের জন্য লেখেন না, দুর্বোধ্য সংকেতে তিনি কথা বলেন, সামাজিক রীতি ত্যাগ করেন। কোনো কবি বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের সংস্কৃতির স্রোতের পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পল্বলের ঐতিহ্যে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, শীতলতা খোঁজেন। কোনো কবি পরিবেশের পীড়ন হতে পালিয়ে অতীতের কোনো শীতল ধর্মবিশ্বাসে আশ্রয় খোঁজেন। পরিবেশকে আয়ত্ত করতে না পেরে, আবেগের ও অভিজ্ঞতার মুক্তির জন্য কেউ সংস্কারের পরিত্যক্ত বাঁধা সড়কে পিছন ফিরে চলেন। শৃংখলাহীন সমাজ হতে কেউ পালান শৃংখলিত প্রকৃতির রম্য ক্রোড়ে। কেউ রহস্যময় পূর্ব-সংস্কারকে ঘিরে আবেগের স্পন্দন লাভ করেন। স্বাধীন ইচ্ছার বিকার ঘটে পরিবেশের বাধায়, দায়িত্বহীন আত্মরতির শূন্যতা বা জঙ্গলময় বিভীষিকা পীড়িত করে, তাই স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করতে হয়। কেউ হন বিবাগী, কেউ খোজেন অলীক মুক্তিতে ভুক্তির অনুকরণ। কোনো কবির ব্যাহত ব্যক্তিত্ব আবার শিশুজগতের হাল্কা ছড়ায় শৈশবের আধাচেতনায় ফিরে যায়। অযৌক্তিক, অসংলগ্ন কৌতুকে কেউ জীবনের অসঙ্গতিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

কাব্যের মূলে যে প্রেরণা তা মিথ্যা নয়। তাই সামাজিকগণের কাছে কাব্যের সার্থকতা রয়ে যায়। এই কবি প্রেরণা, তার আবেগ, দৃঢ় সত্য, তার সৃজনী শক্তি অবশ্য স্বীকার্য, ব্যাহত হলেও তা বাস্তব। তার প্রাণ, তার গতি উপেক্ষার জিনিস নয়। জীবনের প্রমাণ ক্রিয়াশীলতায়, জীবন্ত বলেই কাব্য অসত্য নয়। সাম্প্রতিক বা পুরাতন যে কোনো কাব্যে দোষগুণ সব মিলে একজন সামাজিকের বস্তুস্পৃষ্ট মনের বহির্মুখী আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিমনকে সমাজের সূক্ষ্মতম বীণাযন্ত্র বলা হয়।[৫৫] সেই বীণাতারে সামাজিক কামনার আবেগ ধ্বনিত হয়। তারই ঝংকার সাড়া জাগায় দেশজোড়া মানুষ চিত্তে। কবিই জীবনের আর পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে কান পেতে আছেন। ক্ষুদ্র অঙ্কুরোদ্গম হতে বিরাট ভূকম্প, দূরে ও নিকটে সবই সেখানে ধরা পড়ে। কাব্যের সঙ্গে সমাজজীবনের যোগ সব সময়ই ঘনিষ্ট। আত্মরতির কাব্যও তাই সমাজবহির্ভূত নয়—বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থার সাক্ষ্য সেখানে। কাব্য দেশ ও কালের মুকুর—কবিই যুগের পরিচয়। কালের বিচারে কবিই সমাজজীবনের চিরজাগ্রত সাক্ষী।

৫৫ বিনয় ঘোষ

কাব্যের প্রতি পদক্ষেপ সমাজবিবর্তনের গতিছন্দে বাঁধা। কবির বিষয় ও ভঙ্গি কবির সামাজিক চেতনায়।[৫৬]

এখানে কাব্যের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নিয়ে একটা প্রশ্ন ওঠে। গেটের ভাষায় বলা যেতে পারে যে কবির কাছে কেউ শিখতে যায় না, কিছু হতে যায়।[৫৭] কোনো নীতিজ্ঞান কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। রসোপলব্ধি এক আত্মোপলব্ধি কিন্তু স্বয়ম্ভুরূপে নয়, বস্তু ও সমাজের আত্মীয়রূপে; অবাঞ্ছিত আগন্তুকরূপেও নয়। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গমজাত সামাজিক এক আনন্দের উপলব্ধিতে এবং তার প্রকাশের আবেগে কাব্যের জন্ম। পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায় কবিপ্রাণে যে সাড়া জাগে তার অধিবাসনে ও অনুরঞ্জনে বহির্জগতের বস্তু কবিমনের বিভাবে, ব্যক্তির চিত্তজগতের বৃত্তিময় সত্তায় পরিণত হয়। শাব্দিকরূপে এই বিভাব কবির নিকট ও অন্য সামাজিকগণের নিকট দ্যোতিত হয়। কবিহৃদয়ের দুটি বৃত্তিই এই সৃষ্টিতে তৃপ্ত হয়—একটি মুক্তির আবেগ, একটি ভুক্তির আবেগ। মুক্তির আবেগে সমন্বয় ঘটে অনুভূতির সাধারণীকরণ হয়। ভুক্তির আবেগে রূপ সৃষ্টি ঘটে, চোখের তৃষ্ণায় প্রতিমা গড়া হয়। সাধারণ সত্তা চৈতন্যের অনুভূতিতে ও অপরকে নিজ সুখদুঃখের অংশীদার করার ইচ্ছায় পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধের লোপ হয়। ব্যক্তিত্বের অভিমান খসে পড়ে। কবির যে আবেগ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, সেই আবেগ ব্যক্তিরও চিত্ত শুদ্ধি করে।[৫৮] সহৃদয় পাঠক শ্রোতার হৃদয়েও কাব্য পাঠে ও কাব্য শ্রবণে অনুরূপ রস সঞ্চার হয়। কবি সমাজকে জীবনের রসাস্বাদনে আমন্ত্রণ করে সামাজিক হিসাবে তৃপ্তি অনুভব করেন। সামাজিকতাই নীতি।[৫৯] কাব্যের এই নীতিমান নির্ভর করে কবির ব্যক্তিত্বের উপর। বিরাট ব্যক্তিত্বই বিরাট কাব্য সৃষ্টি করে।[৬০] ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর ব্যক্তি অসামাজিক, অসামাজিকের কাব্যও অসামাজিক। যিনি সার্থক কবি তাঁর চেতনা ও আবেগ মহৎ, সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে—কবিকে আপন মনে হয়। সামাজিক জীবনের মূলবিধি এ কবির আবেগ লঙ্ঘন করে না। বিদ্রোহীও সামাজিক—সকলকে নিয়ে সে নতুন সমাজ গড়তে চায়। যেখানে চিত্তের জাতীয়করণ হয় নি সেখানে আবেগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৈত্যের অধিকারে, কাব্য সেখানে স্বপ্নের আমির অসঙ্গত ও অসংগঠিত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। কাব্য

৫৬ Wordsworth সম্পর্কে Harper ও Cyril Connolly

৫৭ Goethe-র Winckelmann সম্বন্ধে উক্তি

৫৮ বঙ্কিমচন্দ্র

৫৯ Freud

৬০ Lin Yutang

সেখানে প্রাণহীন—তার অঙ্গে অঙ্গে জড়ের বন্ধন, চেতনাহীনতার মরণকাঠির স্পর্শ। উন্মাদের স্বাধীন আমির জীবনী বা খেয়ালের দিনপঞ্জী রচনায় কবি তখন আত্মহারা। কেউ আবার রুগ্নমনের আত্মরতিতে মশগুল—আপন রোগের কথা নিয়েই যার মনের জগৎ। যে সমাজ উন্মাদ ও রোগী, স্বপ্ন ও অপেরণ নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে গবেষণা করে, সে সমাজ কবির ভাববিলাস বা আত্মম্ভরী স্পর্ধা সত্ত্বেও কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না, কারণ তা হলে ব্যক্তির ও সমাজের অনেক অসুস্থতা ও ত্রুটি সম্বন্ধে অজ্ঞই রয়ে যেতে হবে।

ব্যক্তিত্বই কাব্যের স্রষ্টা কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের অধিবাস সাধারণীকরণে ; সাধারণ সত্তাচৈতন্যের অনুভূতিতে। কবির আমি স্বপ্নের বা বিকৃত মস্তিষ্কের স্বাধীন আমি নয়। স্নানাগারের নিঃসঙ্গতা[৬১] কবির চেতনার পক্ষে মারাত্মক ; আবেগ সেখানে তুচ্ছতাপূর্ণ। কবি তাঁর কাব্যপ্রতিভায় জগতকে রঞ্জিত করেন তাই তাঁর সামাজিক দায়িত্ব অবশ্য স্বীকার্য। প্রয়োজন নিরপেক্ষ কাব্য সমাজে সম্ভব নয়। কাব্য জ্যামিতিক চতুষ্কোণ বা ত্রিভুজের অনৈতিকতা নিয়ে চলতে পারে না। বিমূর্তনে কাব্যের প্রাণ নয় কারণ কবি মূর্তির পূজারী, রূপকার। কাব্য আর বীজগণিত এক নয়। কবিকে তাই মনে রাখতে হয় যে তিনি প্রজাপতি বা স্রষ্টা। বিশ্ব তাঁর নিকট যেমন প্রীতিকর মনে হয়, তেমনিই তা পরিকল্পিত হয়। তিনি বীতরাগ হলে সবই নীরস।[৬২] এখানেই ব্যক্তি স্বরূপের চারিত্রিক গঠন কাব্যে ছায়াপাত করে। কবি তাঁর ব্যক্তি স্বরূপটির বাইরে আর কোনো নীতি বা বিধিনিষেধের প্রভাবে আবেগকে বাঁধতে চেষ্টা করেন না। তাতে কাব্যপ্রাণ কৃত্রিমতায় শুকিয়ে যায়। তবে এই ব্যক্তিস্বরূপটিকে গড়ে তুলতে, সামাজিক ব্যক্তিটিকে মহৎ জীবনের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হতে হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির জন্য মহৎ জীবনের একান্ত প্রয়োজন।[৬৩] কবির চেতনার বিস্তার, অনুভূতির সর্বজনীনতা, বৃহৎ সমন্বয়ের আকাঙ্খাই মহৎ জীবনের সঙ্গে যোগের লক্ষণ। কবির ব্যক্তিত্বের গঠনই সর্বনীতির সার। অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খলতাকেই স্বাধীনতা মনে করে কলাকৈবল্যের প্রচার করে। কাব্য মানুষের সভ্যতাবৃক্ষের ফল বলে, মূলের কাজে ফলের সহায়তা নিষ্প্রয়োজন ও তা ফলের ধর্মবিরুদ্ধ বলে প্রচার করা হয়।[৬৪] ভুললে চলবে না যে ফল বীজ বহন করে জাতির জন্য। ফলও সামাজিক কর্তব্যপরায়ণ। যাঁরা শিল্পের জন্য শিল্পের নামে

৬১ বুদ্ধদেব বসু
৬২ পদ্মপুরাণ
৬৩ মহাত্মা গান্ধী
৬৪ অতুল গুপ্ত

অহংএর জন্য শিল্প বলতে চান, তাঁদের মধ্যেও সমাজের জন্য একটা হাস্যকর ও নির্লিপ্ত পাণ্ডাগিরি চোখে পড়ে। তিনি মহাপুরোহিত হয়ে বাণী দান করতে প্রস্তুত, তিনি ভাষার অভিনব বেশে দর্জিপাড়ার দাদার ন্যায় বাবু হতে প্রস্তুত, তিনি পরোপকারের নিমিত্ত সংসর্গহীন পর্যবেক্ষক হতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর শুধু যোদ্ধা বা সহায়ক হতে আপত্তি। একে কাব্যিক ধনিকতাবাদ বলা হয়।[৬৫] নকল বৈরাগ্যের নামাবলীও এই পথের কবির ভূষণ বা ভেক হতে পারে। অনেকে আবার বীরের আস্ফালনে তৃপ্তি পান, আপন মনের হাওয়া-কলের বিরুদ্ধে ডনকুইকসোটের মতো শব্দবান নিক্ষেপ করে একটা মন-গড়া বিজয় আকাঙ্ক্ষা করেন।[৬৬]

কাব্যের বাহক নিছক বুদ্ধি নয়। বুদ্ধি স্থিতিশীল। কাব্যের বাহক আবেগ। আবেগই জীবনে গতি আনে। আবেগই সাধারণ কর্মপ্রবর্তনার উৎস। বুদ্ধি চেতনার পথে তাকে সংগঠিত করে, প্লাবনের অসংযম হতে রক্ষা করে, সৃজনশীল করে, ধ্বংসাত্মক করে না। সহজ প্রবৃত্তি স্থানীয় প্রাতিস্বিক ক্রিয়াতেই প্রকাশ পায়। সাধারণ কর্মপ্রেরণা সঞ্চারের জন্য সমাজের কাছে কাব্যের আবেগের মূল্য। কাব্য সত্যকে প্রত্যক্ষ করে সমাজমনে আরোগ্য কামনার আবেগ সৃষ্টি করে বলা হয়।[৬৭] কবির 'আমি' জাতীয় আমি।[৬৮] কবির আবেগ শুধু যা আছে তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় না। যা ছিল, যা হতে পারে এই দুইএর সংযোগ ছাড়া সত্যের পূর্ণতা ও সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। জগতের ও জীবনের সম্ভাবনীয়তাও কাব্যের সত্য। আবেগ নিরুদ্দেশের যাত্রা নয়। কবি সমাজকে ও জীবনকে একটা পূর্ণতার ও সম্ভাবনীয়তার দিকে শুঁয়োপোকার সামনের পায়ের মতো আগিয়ে নিয়ে চলেন।[৬৯]

ব্যক্তিত্বের বিকাশ গোষ্ঠীর মধ্যে আশ্চর্যজনক হলেও অবিরাম ঘটছে। ব্যক্তিত্বের আবেগে সমাজমন সমৃদ্ধ হয়।[৭০] কবির ব্যক্তিত্ব সমাজজীবনকে গ্রহণ করে তাকে পরিবর্তিত করতে পারে। অবস্থাকে অতিক্রম করার একটা চিরন্তন আবেগ সৃষ্টির মূলে। নব নব রূপে, নব নব গুণে তা প্রকাশ পায়। এই অতিক্রান্তির আবেগই কাব্যের আবেগ।[৭১] ক্রান্তি একটা বিমূর্ত অতীতের ছন্নছাড়া বৃত্তিময় অবস্থাকে বর্তমানে এনে ভবিষ্যতের বীজ বপন করে। এই

৬৫ Cyril Connolly

৬৬ Wexberg, Dey Lewis ৬৭ Koeslter ৬৮ Caudwell

৬৯ Cattell ৭০ Spearman ৭১ Croce

কামনার আনন্দই কবিকে নন্দিত করে। কলাকৈবল্য প্রচার না করেও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সম্ভাবনা বর্তমান। উদ্দেশ্যমুখী আবেগের সম্মুখের দিকের সম্ভাবনার সাক্ষাৎকারে সমাজের কাছে কবির মূল্য। 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে' বলে কবি জীবনের পূর্ণতর রূপটিকে উদ্ঘাটিত করতে চান। অনুপলব্ধের জন্য যে কামনা তাই সৃষ্টি শক্তি, কাব্যে সেই ইচ্ছাই রূপ সৃষ্টি করে। ইচ্ছাই সত্তার বীজ—মনুষ্য সমাজের ইচ্ছা ব্যক্তির মাধ্যমে কবির কামনায় প্রথমে রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ এই আবেগ ব্যঞ্জনায় গতিশীলতা লাভ করে। আরিস্টটল কবির এই ঘটতে পারার দিকের আবেগকে বস্তুর সর্বজনীন রূপসৃষ্টি বলতে চেয়েছিলেন। কবিকে তিনি প্লেটোর মতো সমাজ থেকে নির্বাসিত করতে চান নি। কবিরা এক হিসাবে সামাজিক হয়েও বিপ্লবী, ভাবরাজ্যের ধরভাঙার দলের অগ্রদূত। কবির চিরজাগরুক মানসদৃষ্টিতে আকারের ও রূপের অনন্ত মহাযাত্রা। কালের অনন্ত প্রবাহে প্রাণের অভিব্যক্তি হয়ে চলেছে রূপ হতে রূপে। কোনো এক শিল্পীর তুলির টানে টানে যে রেখা আঁকা পড়ছে, তাতেও যেন ছবির পরম পরিচয় ফোটে নি। কবির চোখে অন্তরের অক্লান্ত বিস্ময় যেন ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, রূপ হতে রূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে। এই দৃষ্টি হতেই কবি সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।[৭২] এই সৃষ্টির সংবেদনে, ভাঙাগড়ার, বিশেষ নির্বিশেষের ছন্দে ছন্দে সমাজমন স্পন্দিত ও নন্দিত।

কবির আবেগের দুটি দিক—একটি ভাব তরঙ্গ, রসবোধ, সুন্দরবোধ, বিশ্ববোধ ও আনন্দের লীলা। আর একটি সেই বোধকে, আনন্দ উপলব্ধিকে অন্য সামাজিকগণের নিকট প্রকাশ করার আগ্রহ ও শিল্পকলা। একটি কাব্যের বিষয়, অন্যটি কাব্যের আঙ্গিক বা অঙ্গ। ভাব জ্ঞানের মতোই শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। শব্দই একমাত্র প্রকাশক। ভাব ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য। বাক ও অর্থ পার্ব্বতীপরমেশ্বরের মতোই সম্পৃক্ত।[৭৩] তান্ত্রিক, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের মতে শব্দের বা পরাশব্দের অজাতবাদের কথা এখানে আলোচ্য নয়। শব্দ ভিন্ন, ভাষাভিন্ন, ভাবের প্রকাশ কাব্যে অসম্ভব এইটুকু মেনে নিলেই যথেষ্ট। ভাষার রূপও কাব্যের বাস্তব, শব্দের প্রতীকী জগৎ কাব্যের বিষয়। কবির কাব্য অনুভূতির বিষয়কে চিন্তার দেওয়া আকার[৭৪] কি চিন্ত্যমানকে অনুভূতির দেওয়া রূপ,[৭৫] এই সূক্ষ্ম বিচারে প্রবেশ না করেও বলা চলে যে প্রতিরূপে ও ভাবে বা

৭২ রবীন্দ্রনাথ
৭৩ কালিদাস
৭৪ Croce.
৭৫ Gentile.

বিষয়ে ভিন্নতা বোধ চিন্তা করা কঠিন। প্রকাশের অনিবার্যতাতেই সৃষ্টি। শব্দের প্রতীক ভিন্ন কাব্যের কোনো নিরাকার ভাব চিন্তনীয়ও নয়।[৭৬] প্রতিরূপ সৃষ্টি ও প্রকাশ এক। শব্দে ও শব্দের ব্যঞ্জনায় কাব্যের বিষয়ের সত্তা। সহৃদয় চিত্তে শব্দোপনীত মানস পদার্থই বস্তু বা বিভাব। কবির কল্পনাত্মক প্রজ্ঞার প্রকাশ-রীতিতে বস্তু ও তথ্য দ্বিজত্ব লাভ করে।[৭৭] কবির আবেগ ব্যঞ্জনা কবির ব্যক্তিত্ব-স্বরূপই প্রকাশ করে না, এই প্রকাশব্যঞ্জনাই বাস্তব। এই প্রকাশশৈলীই কাব্যের পদার্থ বলা চলে।[৭৮] কবির স্বরূপ ও বিষয় এই ব্যঞ্জনায় একাত্মভূত। কাব্যের ভাষা, শব্দ, অক্ষর বা শব্দ যোজনা কবির ব্যক্তিত্বস্বরূপ ও বাহিরের বস্তু বা বিষয় একাত্মভূত হয়ে অনবদ্যতা লাভ করে। এই মিলন একটি বিশিষ্ট বাণীরূপে ফুটে উঠে। কাব্য মন্ত্র হয়ে ওঠে।[৭৯] কাব্য মন্ত্রের মতোই মানসিক রূপকে বাহিরে প্রকাশ করে, অপরের মানসচক্ষে ফুটিয়ে তোলে, শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যায়।[৮০] শব্দও অনন্যতা লাভ করে।

কবির বিশেষ ব্যঞ্জনায় শব্দের বাচ্যার্থের পরিধি বাড়ে। শব্দ সামাজিক সম্পদ। সামাজিক জ্ঞান ও সংস্কার, সামাজিক স্মৃতি ও প্রত্যয় শব্দের পিছনে। বাচ্যার্থ সামাজিক। যে সামাজিক উপলব্ধি করেন, তিনি যেমন তাঁর অভিজ্ঞতা সামাজিক শব্দের ব্যবহারে প্রকাশ করতে চান, তেমনি উপলব্ধার ব্যঞ্জনার উপরই শব্দের অর্থের, ভাবের বাণীরূপের অনন্যতা। কবির বিশিষ্ট সংযোজনে, আবেগের প্রসঙ্গে, শব্দের সূক্ষ্ম অনুরণন, স্পন্দন ও ধ্বনি অনুমিত ও প্রত্যক্ষ হয়। কবির কল্পনা ও আবেগ সংগঠন আর্থীব্যঞ্জনায় শব্দে অলৌকিকতা ও অপূর্বতা সঞ্চারিত করে।[৮১] কোনো বস্তুর বোধ বা চেতনা বিচ্ছিন্নতায় নয়, একটি বিশেষ পরিবেশ প্রকরণে তার সত্তা ও অর্থ।[৮২] শব্দের অর্থও তেমনি শব্দ প্রকরণে বা ব্যঞ্জনায়।[৮৩] আবেগ যেমন বস্তুতে একটি ব্যক্তি স্বরূপের বর্ণ বিচ্ছুরিত করে, শব্দেও তেমনি এই আবেগস্বর ও ধ্বনি সঞ্চারিত হয়। কবির আবেগই শব্দকে একটি শোভা ও গতিভঙ্গি দান করে, তাই অতি সাধারণ হাত পাওয়ালা শব্দের দেহে একটি অভিনব দোল ও দ্যোতনা, প্রসাদ ও ভঙ্গিমা, বক্রতা ও [illegible] ওঠে।

৭৬ Croce. ৭৭ Pater.

৭৮ Marx-এর Style সম্বন্ধে Leibnecht-এর উক্তি 'Style is the matter.'

৭৯ Sri Aurobindo—'The Future Poetry'. 'Abercrombe'—'incantation.'

৮০ Abercrombe. ৮১ Shelley, Abercrombe.

৮২ Gestalt Psychology. ৮৩ Miller—'That which is suggested is meaning.' Moore—'Meaning is context.'
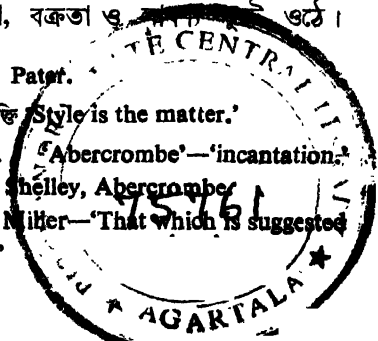
সেখানে ব্যক্তিত্বের ছাপ। শব্দের অর্থকে তাই ব্যক্তিত্বময় বলা হয়। শব্দ প্রথমত মানুষের সামাজিক জীবনের ভাবের বাজারের মুদ্রা।[৮৪] এর মারফতেই অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান। সামাজিক চেতনার উত্তরাধিকারী হিসাবে শব্দের ও প্রত্যয়ের এই সামাজিক প্রতীক ব্যবহার করেই কবি সামাজিক চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রতীকের এই সাধারণ বোধগম্যতা সামাজিক চেতনার ও সংস্কারের সৃষ্টি। এর ব্যবহার সামাজিকতার লক্ষণ। নূতনত্বের এখানে একটা সীমা আছে। কবির ভাষা কাগজের মুদ্রা। এর মূল্য নির্ভর করে সমাজমনের ও কবিমনের যুক্ত ও সাধারণ স্বর্ণভাণ্ডারের উপর। তা না হলে একটা বিপজ্জনক উৎসারেই ভাবের জগৎ ভেঙে পড়ে।[৮৫] কবির দুর্বোধ্যতার পিছনে শুধু কবির নিজের দোষই নয়, সমাজগঠনের দোষও।[৮৬] সামাজিকতার বন্ধন লঙ্ঘন করলে কবির দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রকাশ পায়। নৃত্যের সামাজিক আঙ্গিকেই উল্লম্ফণের অর্থ। আনন্দে বা দুঃখে শুধু লাফানোয় নৃত্য হয় না—শুধু কাঁদায় কাব্য হয় না। শব্দের সামাজিক বন্ধনের মধ্যেই, কবির আবেগ ধ্বনি ও ব্যক্তিত্বের দ্যোতনা শব্দে ও ভাষায় একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় নবীনতার জোয়ার আনে। ব্রাউনিং একে বলেন—নূতন রং করা। সুকান্ত লিখলেন,

পাখি সব করে রব রাত্রি শেষ ঘোষণা চৌদিকে,
ভোরের কাকলি শুনি, অন্ধকার হয়ে আসে ফিকে,
হয়তো এখনি কোন মুক্তি দূত দুরন্ত রাখাল,
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল।

বহু পুরাতন 'পাখি সব করে রব' কবিতার ভাষায় এই ভাবে একটি নূতন ভাব দ্যোতিত হয়ে নূতন অনুভূতির রোমাঞ্চ জাগায়। বহু প্রচলিত শব্দের ঔজ্জ্বল্য ও কবির নবতর আবেগ সংগঠনে ও নূতন প্রকরণে, নূতন সংস্থানে ও সংযোগে বর্ধিত হয়, তার অর্থ ভাবসমৃদ্ধ হয়। ভাষায় ধ্বনিসম্পদ এইভাবে বেড়ে চলে। সামাজিক স্মৃতিতে বাচ্যার্থের পরিধি বাড়তে কমতে থাকে। ভাষা ও ভাবের গুণসাম্য, আবেগ ব্যঞ্জনায় তাদের তুল্যস্কন্ধতা মনে রাখলে কোনো কাব্যেই শুধু শব্দের বা শুধু ভাবের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা হয় না। যেখানে শুধু শব্দ গেঁথে গেঁথে কবিতা রচনা করা হয়েছে মনে হয় এবং শব্দের দোল মনকে প্রায় অভিভূত করে, সেখানেও শব্দের নির্বাচনে বা ধ্বনিতে কবিমনের ভাবাবেগের একটি বিশিষ্ট

৮৪ Caudwell. ৮৫ C. Connolly. ৮৬ Richards.

ঢং নিগূঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[৮৭] শব্দের মূল্য সেই গূঢ় আবেগের ধ্বনি মূল্যে। যেখানে ভাব সংক্রমণ স্পৃহা নেই সেখানে সাহিত্যও নেই। হৃদয় সংবাদ নিরপেক্ষ আত্মপ্রকাশকে শিল্পের মূল কথা বলা ভুল।[৮৮] অপরকে, অন্য সামাজিককে জানাতে চাই জানতে চাই, বলেই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকাশের সামাজিক ধর্ম বা রীতি না মানলে আত্মপ্রকাশ হয় না। আত্ম আলোড়ন আত্মপ্রকাশ নয়। কবি তাই আগিয়ে চললেও, একলা চলাকে গর্বের বস্তু মনে না করে দুঃখের কথাই মনে করেন।

ভাষামাত্রেই অন্য সামাজিকের নিকট মনের ক্রিয়াশীলতার প্রকাশ। বিভিন্ন ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গি হতে বাধ্য। কাব্যের ভাষায় ও গদ্যের ভাষায় অনেক সময় একটা গণ্ডি টানা হয়। গদ্য অর্থাৎ প্রকৃত গদ্য সংবাদের ভাষা, কাব্য সংবেদনের ভাষা। আবেগের ভাষা, মিলনের ভাষা, সংক্রমণের ভাষা কাব্য। জ্ঞাপনের ভাষা, তর্কের ভাষা তিরস্কারের ভাষা, যুক্তির ভাষা গদ্য।[৮৯] খণ্ডিত মনের ভাষা গদ্য, সামগ্রিক মনের ভাষা কাব্য। ব্যক্তির বুদ্ধির দম্ভ, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অহংকার গদ্যে ভালো প্রকাশ পায়। সমন্বয় ও সংযোগের আবেগ প্রকাশ পায় কাব্যে। যেখানে দোল, যেখানে মিল, সেখানেই ছন্দ। এই ছন্দ বা rhythm কবির আবেগ প্রবাহের শাব্দিক রূপ—সংগঠিত প্রক্ষোভগতি এখানে ছন্দ-হীনতায় খণ্ডিত হলে কাব্যের রসধারা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রত্যেক কবিতায় যে আবেগ সঞ্চারিত হয় তা কবির ও শ্রোতার হৃদয়কে ও মাংসপেশীকে আন্দোলিত করে। কাব্যের ছন্দে পেশীর এই পেশল স্পন্দনটি বজায় রাখে। একসঙ্গে পা ফেলার তালেই কবিতার কলাচাতুর্য। ভাষাকে ও অক্ষরকে এই ছন্দোবদ্ধ করাতেই কবির শিল্প বা আর্ট। শুধু অক্ষর বা শব্দ ব্যবস্থাতেই নয়, ভাবসঙ্গতিও কাব্যে আবেগ সংগঠনের ছন্দিত গতি অব্যাহত রাখে। কবির চেতনার বৈচিত্র্যকে গেঁথে, নানাত্বকে সম্বন্ধ বদ্ধ করে এবং কবির আবেগের গতিকে ধ্বনিত করে, কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও সমতানের কৌশল একটি অখণ্ড ঐক্যের আনন্দ সৃষ্টি করে। গতি ও যতির ব্যবহারে ছন্দ একটি সুষম পেশী সঞ্চালনের ঐক্যের তৃপ্তি আনে। এই তৃপ্তি নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত। এককের গতি কাব্য নয়—শুধু ক্রন্দন, শুধু হাসি, কাব্যের বিষয় নয়। আত্মীয়তাহীন আবেগ পরিচয়হীন। আত্মীয়তা-বদ্ধ বহুর মধ্যেই একের প্রকাশ। সমতান এই বহুর ভাবঐক্যের তৃপ্তি

৮৭ Arnold Bennet. ৮৮ Carrit.

৮৯ Caudwell.

দেয়।[২০] বিমূর্তনে নানাত্বের ঐক্যের সৌন্দর্য। মূর্তনে প্রাণের সঙ্গে রূপের মিলন।[২১]

প্রচলিত অনেক গদ্য কাব্যের পর্যায়ে পড়ে। আবার অনেক কাব্য গদ্যের ছদ্মবেশ মাত্র। প্রাণ যেখানে মিলনের রসাস্বাদ করে, ব্যক্তি হৃদয় যখন সামাজিক-গণের হৃদয়ের সঙ্গে একতালে, একসুরে, এক আবেগে স্পন্দিত হয়, তখনই দেখা যায় ছন্দ। ছন্দ সহৃদয়গণকে চেতনার একটি সমস্তরে মিলিত করে। যুক্তভাবে তাদিকে একটি বিশিষ্ট স্নায়বিক ও প্রক্ষোভিক ভঙ্গিতে আন্দোলিত করে। ছন্দ বর্জনে কবির সামাজিক বন্ধনের অস্বীকার প্রকাশ পায়, স্বকীয়তার একটি নৈরাজ্যের অভীপ্সাই প্রতিবিম্বিত হয়।[২২]

কবি যখন অসামাজিক হন, প্রতিবেশের প্রতি বিতৃষ্ণায় তখন মানসিক বিবমিষায় ও বস্তু অজীর্ণতায় তিনি সব কিছু ত্যাগ করেন। প্রতিবেশী তখন তাঁর নরক।[২৩] হৃদয় সংবেদন তখন অবান্তর। চেতনা হয় সঙ্কুচিত। অসামাজিক প্রতীক ব্যবহারে বুদ্ধির কণ্ডুয়নের আত্মপ্রসাদে তখন তিনি জীবনের গ্লানি ভুলতে চান। কাব্যের অনুভূতি স্বপ্নের বা উন্মাদনার ছিন্নভিন্ন অনুভূতি নয়। সংগঠিত অনুভূতি সামাজিক শব্দের মারফত সজ্ঞমনে প্রত্যক্ষ হয়। বাস্তব জগৎ আর রসের জগতের যে দ্বন্দ্ব তা শব্দের আর হৃদয়ের সঙ্গীতের মিশ্রণেই সমাহিত হয়। ধ্বনিমান গদ্য শব্দের অনুরণনে যখন বচনাতীতের আস্বাদ দিতে চায়, সংগীতের সুরের মতো কবির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় শব্দ রসজারিত হয়ে ওঠে তখন সে গদ্য কাব্যের পর্যায়েই পড়ে। গদ্য কবিতা বা মুক্তক তাই অপর হৃদয়ের সঙ্গে প্রক্ষোভ সংক্রমণে বা রস সঞ্চারণে নেহাৎ অক্ষম ও অচল বলা চলে না। আবেগের গতি সব সময় মসৃণ পথে, উদার পথে, বিশুদ্ধ আভিজাতিক ছন্দে সমুদ্রের আহ্বানে চলে না।[২৪] জীবনের অসঙ্গত অভিজ্ঞতার মধ্যেও একটা বেগ আছে। ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালির সঙ্গে আপোষ হয় সেখানে।

> 'তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে,
> পার হয়ে যাবে গরুর গাড়ি
> আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে।[২৫]

২০ Aristotle

২১ **Coleridge, 'union of shapely with the vital'.**

২২ **Caudwell,**

২৩ **Jean Paul Sartre**

২৪ রবীন্দ্রনাথ, কোপাই

২৫ রবীন্দ্রনাথ, কোপাই

সামাজিকগণের কাছে পৌঁছাতে কাব্যকে এখন মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়। ছাপার অক্ষরে ব্যক্তিত্বের কতটুকু ধরা পড়ে, আর কতটুকু বাদ পড়ে, তা পরিমাপ করা কঠিন। কেউ আবৃত্ত কাব্যকে অনেক বিষয়ে আদর্শ ব্যবস্থা বলে করেন।[৯৬] কেউ বলেন কাব্য কথিত কলা, লিখিত কলা নয়।[৯৭] কেউ শ্রুতকাব্য অপেক্ষা পঠিত বাক্যে কাব্যের আবেগ সঞ্চারণ অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবেন।[৯৮] আবেগের শিহরণের দিক হতে বলা হয় যে কবিতার শব্দ উচ্চারণে ঈপ্সিত স্পন্দন দেহে ও মনে আপনিই ঘটে ও পাঠকের হৃদয়ে কাব্যের আবেগ সঞ্চার হয়। শব্দের সঙ্গে কবির আবেগ স্বরের কোনো সম্বন্ধ না থাকলে, তাঁর উপস্থিতির আর কেনো প্রয়োজন আছে কিনা বলা কঠিন। শব্দের ঠিক যোজনা হলেই, সঠিক উচ্চারণেই আকাঙ্ক্ষিত আবেগ পাঠকমনে উদ্দীপ্ত হতে পারে। শব্দের এই কৃত্রিমতার উপর জোর দিয়ে বলা হয় যে কবি ভয়ের ভাব অনুভব না করেও, ভয়ের চিহ্নের দ্বারা ভয়ের ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন।[৯৯] ভাষার সামাজিক স্মৃতি বা অনুষঙ্গ পাঠকমনে এইভাবে কাজ করতে পারে। অনুমিতিই অনেকের মতে জ্ঞান বা অনুভব। অনেক কবিও বলেন যে কাব্যের উপাদান ভাব বা ভাবনা নয়, ভাষা।[১০০] কাব্যের এটা কৌশলের দিক। প্রেরণার দিক এখানে উপেক্ষিত। আবেগে প্রত্যক্ষ অনুভূত হওয়া এক আর তাকে ভঙ্গির দ্বারা অনুমান করা আর এক। কাব্যের ভাষায় যে রসবোধ জাগ্রত হয়, সেখানে একটি ব্যক্তিহৃদয়ের স্পর্শ, তার আবেগের উষ্মতা মেলে। নাটকে আবেগহীন, আত্মসংযমী হতে বলা হয়—নাট্যে নিজে অনুভব না করে অপরের হৃদয়ে অনুভূতি জাগানো সম্ভব।[১০১] কাব্যে কবির অস্মিতা তাঁর ভাবনার সাধারণীকরণের সঙ্গেই আমাদের হৃদয় জুড়ে বসে। কবির অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাব ও ভাবনার, শব্দ ব্যঞ্জনার ও রসসঞ্চারের সূক্ষ্মতা খানিকটা ব্যাহত হতে পারে। প্রক্ষোভ দেহে একটি বিশেষ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। দেহীর কাছে দেহের সংবাদ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

পঠিত কাব্যের সার্থকতা, পাঠকের পাঠভঙ্গি, তাঁর কল্পনার প্রসার, চিত্তের গতিশীলতা, বুদ্ধির নৈর্ব্যক্তিক প্রখরতা, জ্ঞানের বিস্তার, ভাবপ্রবণতা ও

৯৬ **Arnold Bennet.**

৯৭ **Amy Lowell, "poetry is spoken art".**

৯৮ **H. Stephen** ৯৯ **Ogden.** ১০০ **Mallarme**

১০১ **Coquelin**

সামাজিকতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কাব্যের আদর্শ শ্রোতা সমাজমন ও সংঘমন। কাব্যের চেতনা ও আবেগের মূলে সামাজিকতা। তাই সহৃদয় বা সমাজগোষ্ঠীর সামনে কবির কাব্য পরিবেশন অনেক সহজ ছিল। সামাজিকতা ও রস-সংক্রমণ ও সম্মিলিত রসভুক্তি প্রত্যক্ষ ছিল। সহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলীতে আবৃত্ত কাব্য অপেক্ষা মুদ্রিত কাব্য পাঠের রস-সঞ্চারণ পাঠকের অন্তরের ও বাহিরের ক্ষুদ্র পরিবেশের সমরূপতার উপর বেশি অসহায় ভাবে নির্ভর করে। কবি ও শ্রোতা একসঙ্গে আগে মিলিত হতেন। এই সংযোগে শ্রোতারও পরিমিত ব্যক্তিত্বের খোলস্ খানিকটা সরে যেতো। কাব্যকে ব্যক্তি অহমিকার বেড়া ঘন ঘন উল্লঙ্ঘন করতে হত না। মুদ্রিত কাব্য পাঠে রসাবেশ অনেকটা পরোক্ষ। পাঠকের কাব্য-অভিনিবেশ ক্ষুদ্র কক্ষের ও এককত্বের গণ্ডির স্থূলতায় বাধা পায়। কবি এই প্রতিবেশহীন অবস্থায় কিছুটা অসামাজিক হবার সুযোগও পান।[১০২] চেঁচিয়ে পড়তে হলে বাজে চালাকির মোহ কবিদের বোধ হয় কেটে যাবে।[১০৩] কথা ও ভাবকে তখন স্পষ্ট ঋজু ও সহজে হৃদয় গ্রাহ্য হতে হবে। শুধু পাণ্ডিত্য তখন কাব্যে আসবে না। রবীন্দ্রনাথের বিজনবিলাসিনী সরস্বতীকে লোকসভায় আসতে হলে তাঁর বেশভূষার পরিবর্তন হবে। রাজন্যপোষিত বাংলা সাহিত্য যখন ভারতচন্দ্রের পর সাধারণ আসরে নামলো, তখন তাকে নূতন রস পরিবেশন করতে হল।[১০৪]

মুদ্রিত কাব্যের ভাষা চোখে ঠিক থাকলেও পাঠকের হৃদয়ে তার বাঙময় রূপের ও আবেগের পূর্ণধ্বনি সংক্রমিত ও ঝঙ্কৃত করতে পারে কিনা সন্দেহ। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছেন যে তার ধ্বনি তার ছন্দ কানের সাহায্য না পেলে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সার্থক করতে পারে না। সামাজিকতার দৈহিক উপস্থিতিতেও রসানুভূতি ও রসসঞ্চার পূর্ণতা পায়। সম্মিলিত মানবগোষ্ঠী বেশি আবেগপ্রবণ। গোষ্ঠীমনের অনুভূতির গভীরতা ও বেগ ব্যক্তিমনের চেয়ে অনেক বেশি বলেই মনস্তাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন।[১০৫] কাব্যরস তাই গোষ্ঠীমনে ও গোষ্ঠী সম্মেলনে সহজে সঞ্চারিত ও সংবেদিত হয়। কাব্যের সঙ্গে সমাজহৃদয়ের ও সমাজজীবনের যোগ ক্ষুন্ন হলে কাব্য ব্যাহত ব্যক্তিত্বের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়। জীবনপ্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হলে এবং সহৃদয়ের পরিধি হ্রাস হয়ে গেলে কাব্যে

১০২ Oscar Wilde, we have been able to have fine poetry in England because public do not read it and consequently do not influence it.

১০৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র ১০৪ নিরঞ্জন চক্রবর্তী—উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা

১০৫ Mcdougall.

তুচ্ছতার বিলাস ও অসামাজিকতার কুণ্ঠা কি দম্ভ প্রকট হয়ে পড়ে। পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধের লয়ে যে কাব্যের রসের বিকাশ, তা তখন অভিমানের ক্ষুদ্র আবর্তে ঘূর্ণিত হতে থাকে। দম্ভ বা লজ্জা কোনোটাই কবির ভূষণ নয়। বিশ্বকে বর্জন করে স্নানাগারে পলায়ন কবির যোগ্য কার্য নয়।

মুদ্রণের ফলে কাব্যের পাঠকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। অতীতের কাব্য এখন পাঠক সাধারণের সহজলভ্য। অবশ্য সাধারণ পাঠকের মানসিক সজ্জা নিম্নস্তরের। এতবড় শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে কবির দৈহিক উপস্থিতি অসম্ভব। গণশিক্ষার বহুল প্রচারসত্ত্বেও পাঠক ও শ্রোতার মূল্যবোধ সামাজিক নানা কারণে বিকৃত হয়েছে। আবেগের ঐক্য ও গভীরতা বিনষ্ট হয়েছে। সংঘাত ও সংশয় সুকুমার হৃদয়বৃত্তি ধ্বংস করেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কবি হয় শ্রেণীচ্যুত কিংবা ক্ষুদ্র শ্রেণীভুক্ত। তাই শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিধি বাড়লেও, কাব্য পরিবেশন পদ্ধতি কাব্যরস সঞ্চারের পরিপোষক নয়। কবির চেতনার উপর জীবন বিবর্তনের চাপ, সমাজজীবনের কঠোর শ্রেণী বৈষম্য, কবিকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা কোটারীর মাঝে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য করেছে। মুদ্রিত কাব্য পাঠই এখন কাব্য রসাস্বাদের সহজ পথ। কবি যেখানে উপস্থিত সেখানে সম্মিলিত রসাস্বাদে রসসংবেদনের সংকীর্ণতা ও আত্মরতির বিঘ্ন খানিকটা দুর হতে পারে। কাব্যের সামাজিক আবেগ ও রস অসামাজিকভাবে গ্রহণে ও পরিবেশনে বিকৃত হতে পারে। তা ছাড়া কাব্যরস পান করতে হলে পাঠককেও কবি হতে হয় খানিকটা। কাব্য সামাজিক—এক সামাজিক প্রকাশ করেন, অপর সামাজিক আস্বাদন করেন। এখানে দুই এর হৃদয় সংবাদ অর্থাৎ সহৃদয়তা বা হৃদয় সাদৃশ্য প্রয়োজন।[১০৬] কাব্যরস অনুভবসিদ্ধ। যে ব্যক্তির হৃদয় রতিবাসনাহীন তার নিকট প্রেমের কাব্যে কোনো রস-সংক্রমণ নেই, কোনো মাধুর্য-বিকীরণ নেই। পাঠকের অহং এরও কবির সঙ্গে একাত্মসূত্রে সম্বদ্ধ হওয়া চাই। এখানেই ক্ষুদ্র আমিত্বের উত্তরণ—ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফুরণ, এখানেই রসাস্বাদের অলৌকিকত্ব। কাব্য রসাস্বাদ ব্যক্তিত্বের পরিচয় সাপেক্ষ। এই পরিচয়, সম্পূর্ণ মানুষটির পরিচয়, শুধু বন্ধুত্বেই সম্ভব।[১০৭] সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেন না প্রীতিই সমগ্র করে দেখে।[১০৮] বিশ্লেষণ, তর্ক ও ব্যবচ্ছেদের দ্বারা ব্যক্তিস্বরূপটিকে পাওয়া কঠিন। বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণে কাব্য

১০৬ অভিনব গুপ্ত　　১০৭ Joad.

১০৮ রবীন্দ্রনাথ

রস তার রস্ততা হারায়। উপাদানকে জানা এক কথা, আর তার রস আস্বাদ করা অন্য কথা। কাব্য যে ভাবেই পরিবেশিত হোক এই রসবোধ ও সহৃদয়তাই পাঠকের ও শ্রোতার কাব্যরসাস্বাদের মূলে মনে রাখলে কাব্য বিচার ও কাব্যের আবেগ সঞ্চার অনেক সহজ হয়।

মুদ্রণের পর মূল্যের কথা। কাব্যের পক্ষে মুদ্রাযোগ শুভ হয় নি, যদিও গত্যন্তর ছিল না। মূলধনের অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে কাব্যের এদিকটা বিষমভাবে জড়িত। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যতদিন শ্রেণী সংঘাতে বৈষম্য বিকৃত হয় নি, ততদিন কাব্য সমাজে সাধারণের আদৃত ছিল। অর্থনৈতিক চাপে সমাজে সাধারণের সহায় হারিয়ে, কাব্য সমাজপতিদের অভিভাবকত্ব খোঁজে। কাব্যগ্রন্থ ধনীব্যক্তিকে বা অভিভাবককে উৎসর্গীকৃত হল। সমগ্র মনুষ্যসমাজে যা উৎসর্গ করতে হবে [১০৯], তা ব্যক্তিবিশেষের করকমলে কবি তুলতে আরম্ভ করলেন। ব্যাহত ব্যক্তিত্বের অভিমান ক্ষুদ্র গণ্ডিতে লুকাবার পথ ধরলো। যারা কবিকে বরণ করলে না, তাদের প্রতি কবির সহানুভূতি থাকলো না। আবেগের একতা সমাজে বিনষ্ট হল।

সামাজিক বৈষম্যের ও অনৈক্যের পীড়ন হতে সমাজমন বিশ্রাম খোঁজে রোমাঞ্চ গল্পের স্বপ্নবিলাসে। তার অলীকতা পাঠকের নিরঙ্কুশ কামনা চরিতার্থতায় সুখবোধকে সুড়সুড়ি দেয়। তার অপরাধী জীবনের স্বাধীনতা জীবনের দাসত্বকে ব্যঙ্গ করে। অসাড়মন অসামাজিক মননের আবেগে তুচ্ছ তৃপ্তি লাভ করে। প্রক্ষোভের অসমতায় কাব্য অতৃপ্তিকর। কাব্য একাধারে সমাজ জীবন ত্যাগ করে অসামাজিক প্রতীকের পিঠে চড়ে পণ্য হিসাবে অচল। কাব্য ব্যর্থ, কবি নিঃস্ব। সমাজের ও ব্যক্তির এ ব্যর্থতার ইতিহাস। অনাবশ্যক শিল্পী তুচ্ছ সখের খেলনা গড়ায় মশগুল। আত্মবিনোদনই আদর্শ। অথচ সমাজই কাব্যের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হতে পারে।

জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হতে কবি অসন্তুষ্ট হলে চলে না। এই মিলনেই কাব্যের প্রভাবের তাৎপর্য ধরা পড়ে।[১১০] অবসর বিনোদনের শ্রমবিমুখ চিত্ত বিলাসে ও আত্মরতির বিকারেই কবির হাস্যকর ব্যর্থতা। অলসশ্রেণীর আদর্শ অনুকরণে কবির প্রক্ষোভস্বেদ অবান্তর। পৃথিবীকে ও জীবনকে সুন্দর করার অশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেখানে গুরু গুরু গর্জন, গুণ গুণ স্বর সুখে দুখে দিবস রজনী জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মুখরিত করে তোলে।[১১১]

১০৯ Koestler   ১১০ Croce   ১১১ রবীন্দ্রনাথ

সেখানেই জীবনের ছন্দ, সামাজিক মিলনের জীয়নকাঠি। কবি মাটির রসে মাটির ফুলের মতোই পুষ্ট। যদি প্রয়োজনের চেতনা ও আবেগ কবিকে অনুপ্রাণিত করতো, তা হলে হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়, [১১২] বলে আক্ষেপ করতে হত না। দুঃসাহসী বিন্দু আমি বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা' [১১৩] বলে কবি পরিবেশকে জয় করতে পারতেন। তার পরে হবো ইতিহাস [১১৪] বলে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে পারতেন। শ্রমের আবেগেই সৃজনশীলতার আনন্দ। দৈহিক শ্রম মনকে উদ্বায়ু হতে রক্ষা করে। শ্রমের মিলনস্রোতে কাব্য যুক্ত হলে, অলস সৌখীনতার শুষ্ক বালুচরে তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বল সৃষ্টি করতে হয় না। প্রকৃত রূপকার কবি আঙ্গিকের জন্য তাই কুম্ভকারকে তার চাকার পাশে, সূত্রধরকে তার বেঞ্চের পাশে হিংসা করেন। [১১৫]

বেতারের প্রসারে কবিকে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ রাখতে কিছু সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য রুচির স্তরবিন্যাস ঘটায়। একতার আবেগ বৈষম্যের রাজসভায় আদরণীয় হয় না। কাব্যে বাস্তবতা ও পরিবেশ, সম্ভাবনীয়তার আবেগ বেশি প্রকট হতে পারে। রোমাঞ্চনাটিকা, মেরুদণ্ডহীন রোরুদ্যমান অহং এর ক্লীবসঙ্গীত সাধারণ মনের পলায়নী মনোবৃত্তির স্বাচ্ছন্দ্যের পোষকতা করে। পরিবেশহীন সুরের পরিবেশন মৃত মনকে ক্ষণিকের নাড়া দেয়। সমাজমন গঠনে ও জাতির ঐক্যবদ্ধ ভাবধারা সংগঠনে কাব্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি ও সমাজ উদাসীন। কলাকৈবল্যের উৎসাহে কবি ভ্রান্ত, সমাজ বঞ্চিত। সমাজ হয়তো সবসময় সব কাব্য গ্রহণ করে না। তবু প্রগতিশীল কবি অগ্রগামী বলেই অসামাজিক নন। তাঁর কাব্য আবেগপ্রবণ ভবিষ্যদ্দর্শী কয়েকজন সহৃদয়ের সাহায্যেই জাতীয় হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরাই কবির অনন্য প্রকাশকে, প্রাণবান আনন্দরেণুকে বহন করেন, ছড়িয়ে চলেন। প্রচল ও প্রগতির দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সর্বস্তরে। বর্তমান ও প্রগতির আপাতঃ সংঘর্ষ সংশয়ের সৃষ্টি করে। এখানেও অনুশীলনের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সর্বময়তা ও সর্বদর্শিতার দ্বারা মিলন ঘটানো সম্ভব। বর্তমানকে অস্বীকার করে, কালের ও কলার গতিপথ আঁকা চলে না। পূর্ণ দৃষ্টিকোণে একটি অপরটির সম্পূরক। উল্লম্ব প্রগতির জন্য বর্তমানের অনুভূমিক স্তরকে স্বীকার করতে হবে। কবি তাই যুগকে অস্বীকার করতে পারে না। কেউ বলেন, বেতারে যদি কবিকে কাব্য পাঠ করতে হয়,

১১২ সুকান্ত ১১৩ সুকান্ত
১১৪ সুকান্ত ১১৫ Goethe

সমাজ মনে পৌঁছাতে, তা হলেও কাব্য অবোধ্য হতে পারবে না এবং বিমূর্ত সাহিত্য শ্রুতির তাগিদায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[১১৬]

অর্থ নৈতিক চাপে কবিকে অভিভাবক খুঁজতে হয়েছে। সর্বস্বত্বসংরক্ষিতের ছাপ মেরে কাব্যকে পণ্য হিসাবে বাজারে ছাড়তে হয়েছে। এ অবস্থায় চিত্তের জাতীয়করণ সম্ভব নয়। অপ্রয়োজনের কবি অলস ধনিকের আশ্রয় খুঁজেছেন, শ্রমবিমুখ ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কলাকৈবল্যের ভূত ঘাড়ে চেপে বসেছে। কবি এ অবস্থায় সুখী হন নাই। আক্ষেপ করেন—

'কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য হীন প্রভু মেনে নিয়ে।'[১১৭]

'সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতার বিরুদ্ধে'[১১৮] কবি বিদ্রোহ করেছেন। তাই রাহুগ্রস্ত হলেও কবি আমাদের নমস্য।[১১৯] বিরোধের নৈরাজ্য কাব্যের পরিপোষক নয়। আবদ্ধতা ও ভয়, হিংসা আর সুবিধাবাদ কবির উপযুক্ত পরিবেশ নয়।[১২০] সমাজজীবনে মিলনের অভাবে কাব্যের মিলনের ভাষা ও আবেগ হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে শ্রান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে শেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অরণ্য পথ ধরেছে। প্রকৃতির অনুকরণ না করে, অর্থ নৈতিক পরিবেশের অনুকরণে শিল্পের জন্য শিল্পের বাণী প্রচারিত হয়েছে। ধর্মহীন সমাজে কাব্যের প্রসার আশা করা ভুল। ধর্ম বলতে এইটুকু মেনে নিলেই যথেষ্ট যে সামাজিক গুণের সর্বোচ্চ চেতনাই ধর্ম।[১২১] কবির পক্ষে সমাজ জীবনে বস্তুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষের মিলনের পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। আবেগের ঐক্যেই যখন কাব্যের রসসংযোগ, আদান প্রদানের রহস্যেই যখন ছন্দ, তখন বিচ্ছিন্ন জীবনের আত্মকেন্দ্রী পরিবেশে কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যরসাস্বাদ প্রায় অসম্ভব।

কেউ বলেছেন কবিকে শ্রমিকদের পক্ষ নিতে। 'Unless he joins it his writing will become increasingly false, worthless as literature ... Must first of all become a socialist in his practical life, must go over to the progressive side of all class conflict.[১২২] কাব্যের বিকাশ ব্যক্তিত্বের মুক্তিতে। তা অসামাজিকতায় সম্ভব নয়। কেউ বললেন— সামাজিক বন্ধনেই ও সকলের সেবাব্রতেই কাব্য ও শিল্প পুষ্পিত হয়ে ওঠে।[১২৩]

১১৬ Valery ১১৭ বুদ্ধদেব ১১৮ সুকান্ত
১১৯ সুধীন্দ্রনাথ ১২০ Cyril Connolly ১২১ Ames
১২২ Stephen Spender— 'The Mind in Chains' ১২৩ Schumann.

অন্ত দিকে বলা হয় দলপতির দণ্ডচালনায় কাব্য হয় না। কেউ বললেন সাম্যবাদের উর্বর ভূমিতে হয়তো সোনার ফসল ফলবে, কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের যন্ত্ররূপে সাম্যবাদী শিল্প আমাদের দার্শনিকদের ভাষায় বন্ধ্যা প্রসূতি।[১২৪] সাম্যবাদী দেশে সংগ্রামের সময়ই যে কাব্যসৃষ্টি দেখা যায় তাকে নগণ্য বলা যায় না। যুগের ভাব ও ভাবনা কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অনুর্বর নয়। 'তুমি যা বলাও আমি বলি তাই' এর ঐশী অভিভব সৃজনশীলতার স্বাধীনতা নষ্ট করে না। যে ভাবেই হোক সামাজিক ধর্মবোধেই শতবৈষম্যের মাঝে ও পরিবর্তনের মাঝে কবি শান্তি ও শিবের বাণী শুনতে পান। ক্ষুদ্র গণ্ডির খেয়ালী রচনায় কি একক মনের খেলনা গড়ায় সর্বস্বত্ব সংরক্ষিতের ছাপ মেরে নিরবধি কালের আশাপথ চেয়ে থাকা বড় দুরাশা, ভীষণ মরীচিকা!

যুগধর্মী কাব্যের মূল্যনিরূপণে পুরাতন কাব্যগুলির মর্যাদার কথা এসে পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পুরাতন কাব্যেরও মূল্য আছে। কিন্তু সেটাই একমাত্র মূল্য নয়। মানবমনে ও সমাজমনের বিবর্তনে পুরাতন স্মৃতি ও সংস্কার শিশুমন হতে অভিব্যক্ত হয়। পুরাতন কাব্যের আবেগ এই ঐতিহাসিক মনকে পরিতৃপ্ত করে। তা ছাড়া মানবমনের কয়েকটি মৌলিকবৃত্তির আবেগ সকল অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। যুগের যুগের কাব্যে তার সাধারণীকৃতরূপ তাই মানুষের মনকে তৃপ্ত করে। পুরাতন কাব্য বর্তমানের কবি ও পাঠকের এক সাধারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জগৎ। সাহিত্যের আঙ্গিক ও রসরুচির মূল্যায়নে ও প্রতিষ্ঠায় এর প্রভাব সংগোপনে কাজ করে। আচারনিষ্ঠ আবেগবান হয়, আবেগবান সামাজিক রীতিবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়।

কবি চিরকালই ভবিষ্যদ্রষ্টা। ধূলোমাটির জগতকে রূপেরসে পূর্ণ করতে কবির রসস্পর্শ ও সংগঠক চেতনার প্রয়োজন। সমাজের ও বস্তু সংঘাতের আহ্বানে কবিকে সাড়া দিতে হয়। বিমূর্ত সুন্দরের স্বপ্নবিলাসে কবির নিশ্চেষ্ট হলে চলে না। কবি যেন হতাশায় বা বিরক্তিতে, তুচ্ছতায় বা অলসতায় না বলেন—

> "I think it better that in times like these
>
> A poet's mouth be silent : for in truth
>
> We have no gift to get a stateman right[১২৫]

নবারুণের হিরণ্ময় আভা কবির কল্পনার শিখরে প্রথম ঝলমল করে উঠবে। মাটিতে তাঁর কান পাতা, অনাগত ভৈরবের পদধ্বনি সেখানেই প্রথম শোনা যায়। আর

১২৪ আইয়ুব। ১২৫ W. B. Yeats

বিষম সমাজজীবনের রুদ্ধদ্বার ক্ষুদ্র কক্ষে আমাদের বন্দী তন্দ্রালস মনকে ধুলোমাটির পথের বাউল কবির করুণ আক্ষেপ, হঠাৎ মোহমুক্তির স্পর্শে নাড়া দিয়ে আজও জাগিয়ে তোলে।

"চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলো আর মাটি,
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের সাই খাঁটি।
রূপের রসের ফুল ফুইটা যায় আমার পরাণ সুতা কই।"

কবির প্রেমের সুর স্তব্ধ হয় নি। কবি বলেন—

"আর কিছু নাহি পারি
আমি তোমাদিকে করি আনন্দ-অমৃতের অধিকারী"[১২৬]

তাই কবিকে আমরা বলি "আছে আছে স্থান।"[১২৭]

১২৬ কুমুদরঞ্জন ১২৭ রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যে ইতরতা

(১) চরিত্রের ইতরতা

তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' এ কবিকে বলতে শুনি—

'কী নহে প্রাকৃত জনগুণ-গানা।
সিরধুনি গিরা লগতি পছিতানা।'

কাব্যে যদি সাধারণ লোকের গুণগান করা হয়, তবে সরস্বতী কপালে করাঘাত করে আপশোষ করেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ীও নাটকের ও মহাকাব্যের নায়ককে প্রখ্যাতবংশ, ক্ষত্রিয়, সুর, ধীরোদাত্ত, গুণান্বিত, রাজর্ষি, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দিব্য কি রামচন্দ্রের ন্যায় দিব্যাদিব্য হতে হতো।

'প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথদিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ ;'[১]

আধুনিক যুগে কিন্তু প্রাকৃতজনের প্রতিই বীণাপাণির পক্ষপাতিত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সকল চরিত্রই রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করবে ভাবতে Oscar Wilde কষ্ট বোধ করেছিলেন, আর বর্তমান যুগের ইংরাজ রাজকবি পতিতবন্দনা করেন—Mine be the dirt and the dross, the dust and scum of the earth ![২] মরমী কবি Yeats-ও যুগচৈতন্যের উত্তেজনায় নর্দমার দীক্ষাভিষেকের কথা ভাবেন—'baptism of the gutter'. আমাদের বাঙালী কবি পরে সাম্রাজ্য চাইলেও যৌবনে বেশ গৌরব বোধ করেছিলেন লিখে—

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের
মুটে মুজুরের
—আমি কবি যত ইতরের।[৩]

অবশ্য কামারের আর ছুতোরের কথা লেখা হচ্ছে বলেই সরস্বতী শিরে করাঘাত করছেন বলে মনে হয় না। সাধারণ লোক অর্থাৎ ইতর জনসাধারণ

১ সাহিত্যদর্পণ   ২ Masefield
৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র—'সাম্রাজ্যও যে চাই আমার একচ্ছত্র অধীশ্বর…'

সম্বন্ধে লেখা বলেই কোনো সাহিত্য ইতর নয়। অন্ত্যজ নায়ক-নায়িকা নির্বাচনেই কোনো সাহিত্য ইতর বা মহৎ হয় না। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে, সাহিত্যের বিষয়ে ও আদর্শে, আঙ্গিকে ও আকাঙ্ক্ষায়, ভিত্তি ও ভাষায় যে ইতরতা ফুটে উঠেছে তাকে শুধু উচ্চশ্রেণীর আওতায় কি নিম্নশ্রেণীর ভাঁওতায় ঢেকে রাখা যায় না। সাহিত্যের এই ইতরতাই এখানে আলোচনার বিষয়।

মধ্যযুগের বংশ কৌলিন্য বণিকযুগের সমান সুযোগের নবকর্ণদেব অভ্যুত্থানে ধ্বসে পড়লো। পুরাতন শ্রেণীর নায়কনায়িকার চারিত্রিক মান ক্ষুণ্ণ হলো। এখানেই ইতরতার প্রথম পর্ব শুরু। নববণিক গোষ্ঠীর হাতে অর্থের নব জন্মলাভের সঙ্গে, ধর্মে ও সমাজে ব্যক্তিই তার বিধাতা হয়ে ওঠে। নব-মানবতার উন্মেষে মধ্যযুগীয় কুলমর্যাদা আর পাপভাববোধ কেটে যায়। অর্থের নূতন সম্ভাবনার মধ্যে সাধরণ মানুষেরও অনন্ত সম্ভাবনা দেখা যায়। পুরুষকারে বিশ্বাস আর মানুষ হিসাবে মানুষের সম্মানবোধ জাগে। ভগবানের চোখে সবাই সমান এটা স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা হয়। খৃষ্টধর্মের উদ্ধারবাদ নবতর জীবপ্রীতি ও ক্ষমাশীলতায় সার্থক মনে হয়। 'Christ has delivered and redeemed us all, the lowly as well as the great, without exception'[৪]—এই বাণী ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থনৈতিক বিপ্লবে সত্য হয়ে উঠে। পাপপুণ্য অপেক্ষা পুরুষকার, সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনা, বংশ অপেক্ষা ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্বলতা ও দুঃখ, ক্ষুদ্রতা ও স্খলনের প্রতি ক্ষমাশীলতা দেখা যায়। অবিমিশ্র গুণাবলীর অধিকারী যে মানুষ, সে মানুষ হিসাবেই আর গণ্য হয় না। সে রকম চরিত্রে সাহিত্যের আর উৎসাহ থাকে না। মানবপ্রীতির এই সাহিত্যে, বস্তুর সংঘাতে ও ভিতরের দ্বন্দ্বে, জয়ের চেয়ে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়েই মানুষ মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। সেক্সপীয়রের শোকান্তক নাটকের নায়ক-নায়িকারা এর সাক্ষ্য দেয়। এর পর Satan কি Prometheus এর প্রতি সাহিত্যিক সহানুভূতি খুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ফরাসী বিদ্রোহের সাম্যের মন্ত্র সকলের সমান অধিকার সাহিত্যেও প্রতিষ্ঠিত করে। কুৎসিতও তার অস্তিত্বের দাবি সাহিত্যের দরবারে জাহির করে। বোদ্‌লেয়র লিখলেন—[৫]

> 'কুৎসিত একটি লোক ঢুকলো এসে ঘরে,
> নিজেকে সে দেখতে লাগলো আয়নাতে
> সেই দেখার ফল যখন শুধুই বিতৃষ্ণা।

৪ Religions & the Rise of Capitalism—Tawney

৫ অনুবাদ হতে উদ্ধৃত।